উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ

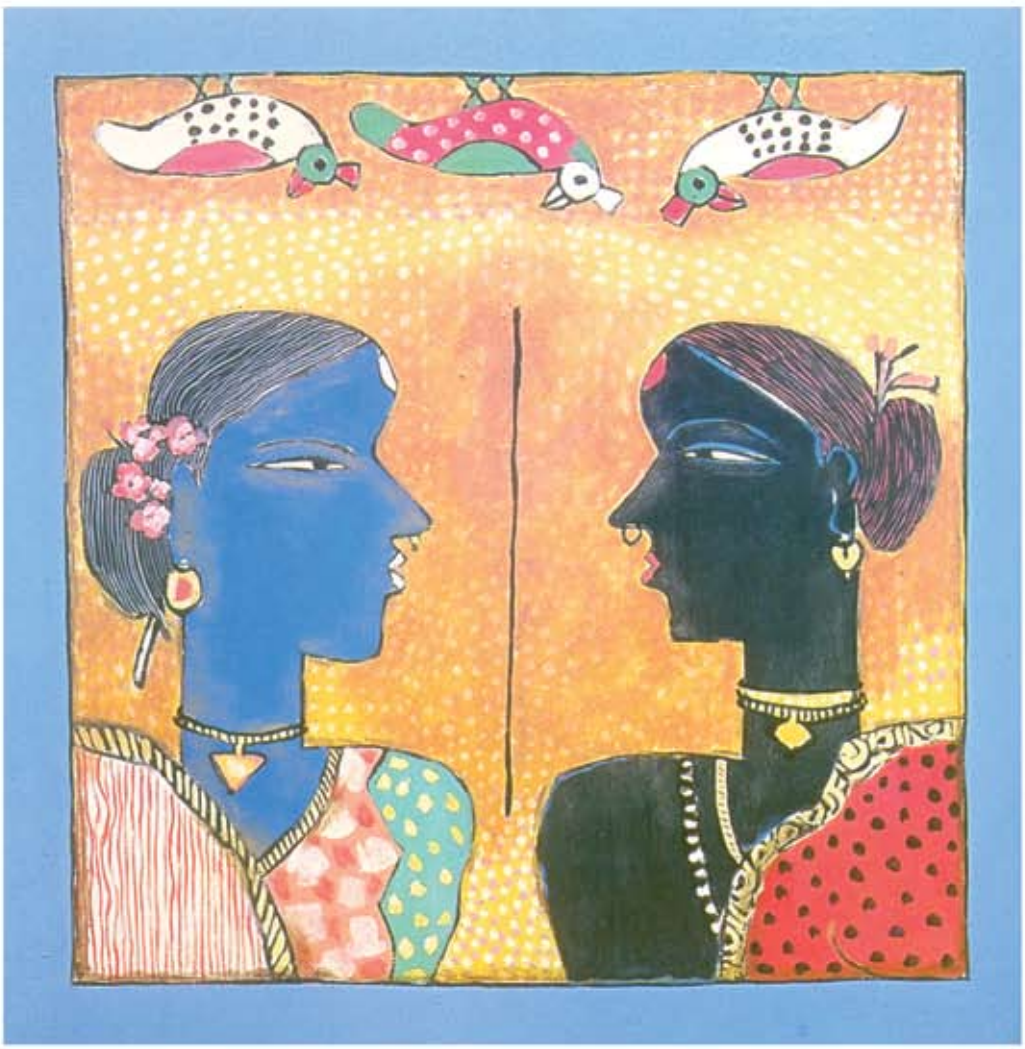

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)

প্রকাশকাল
জুলাই ২০১২

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেশক
ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ ড. জসীম উদ্দিন

সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য
একেএম নুরুজ্জামান শারমিন মৃধা

প্রচ্ছদ
আবদুস শাকুর

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন
প্লট-ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ৯১৪০০৫৬-৫৯, ৯১২৬২৪০-৪২ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org ওয়েব সাইট: www.pksf-bd.org

মুখবন্ধ

প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। বিশ্বব্যাপী নারীর সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করা হয়।

মূলত কাজের পরিবেশ মানবিকীকরণের দাবীতে ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ সর্বপ্রথম শিকাগো শহরে সূতাকলের নারী শ্রমিকরা একতাবদ্ধ হয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করেন। তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করার বিষয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারী শ্রমের যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা আদায় করার জন্য তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। বাংলাদেশের নারীরা গৃহ ও কর্মক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান প্রতিষ্ঠা এবং দেশের উন্নয়নের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। অথচ এদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। আমাদের সমাজে নারীদের অবস্থান সংহত তো নয়ই বরং দৃশ্যমানভাবে দুঃখজনক। তবে সুখের বিষয় এই যে, নারী-আন্দোলন এখন সুসংগঠিত হয়ে উঠছে এবং এ বিষয়ে সকল মানুষের মধ্যে এক ধরনের সদর্থক সচেতনতা তৈরি হয়েছে। এই সূত্রে আমাদের আবশ্যিকভাবেই স্মরণ করতে হবে এদেশের তথা প্রাচ্যের নারী অধিকার আদায়ের অসামান্যা প্রবক্তা রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনকে। তিনি শুধু সমাজে নারীর অধঃস্তন অবস্থান নিয়ে সুতীব্র ভাষাসমৃদ্ধ সাহিত্য রচনা করেননি, প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা প্রসারে প্রায় এক বিদ্রোহী ও সফল ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমরা সকল উন্নয়নকর্মে যেন এই মহীয়সী নারীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি।

এই সত্য আজ প্রায় সবাই স্বীকার করেন যে, নারীকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এদেশে নারীদের প্রতিনিয়ত নানা ধরনের সামাজিক সমস্যা ও বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং অধিকার আদায়ে বিভিন্ন নারী সংগঠনের বিরতিহীন দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার একটি প্রগতিশীল নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তাছাড়া নারীর স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সাল থেকে পিকেএসএফ তার সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া নারীসমাজকে লক্ষ্যভুক্ত করে তাঁদের উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এইসব কর্মসূচি নারীকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে নিজের সামর্থ্য ও ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করছে। বিভিন্ন আর্থিক ও সমাজসেবামূলক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ পিকেএসএফ-এর অন্যতম অর্জন।

সম্প্রতি পিকেএসএফ-এর 'সমৃদ্ধি' কার্যক্রমের পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন মডেলে নারীকে মূল প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর মোট উপকারভোগীদের প্রায় ৯০% নারী। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর মোট ২৭১টি সহযোগী সংস্থা রয়েছে, যার মধ্যে ২৮টি সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন নারী। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, নারীদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ তাঁদের জন্য সম্মানজনক ও সুদৃঢ় একটি সামাজিক অবস্থান তৈরি করতে সাহায্য করেছে। পাশাপাশি তাঁদের নিজেদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস

বহুগুণে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। নারী ঋণগ্রহীতারা বর্তমানে নিজ অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন হয়েছেন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা অর্জন করেছেন। তাঁরা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক শক্তিশালী ভূমিকা রাখছেন, পারিবারিক আয় উপার্জনে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। অনেক দরিদ্র মহিলা তাঁদের নাজুক সামাজিক ও পারিবারিক দৈন্যদশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন। পিকেএসএফ নারীদের লক্ষ্যভুক্ত করে সকল প্রকার সুযোগ সৃষ্টি এবং সুযোগ গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, নারী ঋণগ্রহীতারা এখন ঘরের বাইরে এসে মানুষের সঙ্গে একত্রে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করেছেন এবং তাঁদের অনেকে নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করছেন। অনেক উপকারভোগী নারীসদস্য তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। ভবিষ্যতে পিকেএসএফ তার এ যাবৎকালের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে নারীদেরকে লক্ষ্যভুক্ত করে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থ প্রবাহ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, মূল্যবোধ, সুযোগ সৃষ্টি ও গ্রহণের স্বাধীনতাসহ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে কাজ করে যাবে। আমরা বিশ্বাস করি, এর ফলে নারীরা সকল প্রকার বঞ্চনা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেদেরকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

৮ মার্চ সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই দিবস পালনের মধ্য দিয়ে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নারী পৃথিবীর সর্বত্রই বৈষম্যের শিকার। আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় নারীর প্রতি অবিচার দূরীকরণ এবং তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পিকেএসএফ-এর উন্নয়ন এজেন্ডায় নারীর অগ্রাধিকারকে বিশেষভাবে বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু এবারই প্রথমবার আমরা নারী দিবস পালনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম একটি সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে।

নারী দিবসে সেমিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে পিকেএসএফ তার কার্যক্রমের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, যা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে এবং বৃহত্তর পরিসরে পালিত হবে। সেমিনারে মোট ২টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. জাহেদা আহমদ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'নারী উন্নয়ন ভাবনা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক জনাব সেলিনা শরীফ এবং তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা'। প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে উপস্থিত অনেকেই অংশগ্রহণ করেন।

'উন্নয়নে নারী ও পিকেএসএফ' এই প্রকাশনাটি মূলত নারী দিবসে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত দু'টি প্রবন্ধ, তৎপরবর্তী মুক্ত আলোচনা এবং নির্বাচিত নারী উদ্যোক্তাদের সফল কাহিনীর ভিত্তিতে গ্রন্থিত। সেদিক থেকে এই প্রকাশনাটির একটি আলাদা চরিত্র আছে। আশা করি পাঠক মহলে এটি প্রশংসিত হবে এবং দেশের তথা সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে।

পুস্তিকাটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

ড. জসীম উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জুলাই ২০১২

সূচি

১. সেমিনারের কার্যবিবরণী ০৭
২. নারী উন্নয়ন ভাবনা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ১৬
৩. নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা ২১
৪. নির্বাচিত সফল নারী উদ্যোক্তাদের সফল কাহিনী ২৫
৫. অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও উপকারভোগীর তালিকা ৫১
৬. নারীপ্রধান সহযোগী সংস্থার তালিকা ৫২

সেমিনার

নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা
১৫ মার্চ, ২০১২
পিকেএসএফ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

কার্যবিবরণী

বিগত ১৫ মার্চ, ২০১২ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর উদ্যোগে "নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা"- শীর্ষক একটি সেমিনার পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে পিকেএসএফ-এর ১৭টি সহযোগী সংস্থার নারী নির্বাহী প্রধান, ৮ জন নারী প্রধান পরিচালিত সহযোগী সংস্থাসমূহের নারী প্রতিনিধি, ১০টি সহযোগী সংস্থার পুরুষ নির্বাহী প্রধান, ১৮টি সহযোগী সংস্থার নারী উপকারভোগী, LIFT-কার্যক্রমভুক্ত ২ জন উপকারভোগী, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. প্রতিমা পাল মজুমদার, সাধারণ পর্ষদের সদস্য জনাব মাজেদা শওকত আলী, ফাউণ্ডেশনের সভাপতি, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকদ্বয়, মহাব্যবস্থাপকগণ এবং পিকেএসএফ-এর সকল নারী কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

শুরুতেই পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) ড. জসীম উদ্দিন নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত 'নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা' শীর্ষক সেমিনারে সকলকে স্বাগত জানান। পিকেএসএফ আয়োজিত এ ধরনের অনুষ্ঠান এটিই প্রথম বলে তিনি উল্লেখ করেন, আজকের সেমিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল যা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং বৃহত্তর পরিসরে পালিত হবে। তিনি শিকাগো শহরের সূতাকলের নারী শ্রমিকদের কথা স্মরণ করেন, যারা কাজের পরিবেশ মানবিকীকরণের দাবীতে ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন। তিনি জানান, দেশের বিভিন্ন অফিসে প্রায় ১ কোটি ৬২ লক্ষ নারী শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন যাঁরা সমমর্যাদা আদায় এবং বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ আমরা এ সেমিনারের মাধ্যমে এ সংগ্রামের ইতিহাস জানবো। এ পর্যায়ে তিনি, পিকেএসএফ-এর সভাপতি জনাব কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-কে সেমিনার পরিচালনা করার অনুরোধ জানান।

পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয় প্রথমেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন বেশ কয়েকজন প্রথিতযশা নারীদের স্মরণ করেন, যাঁরা বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন, যেমন- জাহানারা হক, সালমা সালাহউদ্দিন, মালেকা খান প্রমূখ। তিনি বলেন, আজকের এ অনুষ্ঠান পিকেএসএফ-এর কাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যদিও আজকে প্রথম এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে কিন্তু আরো আগেই এ ধরনের অনুষ্ঠান করা উচিৎ ছিলো। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতিতে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যোগদান করে তিনি নারীদের ভূমিকা জোরদার করার চেষ্টা করেন যা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে।

সেমিনারে মোট ২টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রথমে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জাহেদা আহমদ। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'নারী উন্নয়ন ভাবনা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ'। তিনি প্রথমেই বলেন যে, আজকের অনুষ্ঠানে নারীদের উপস্থিতি দেখে তিনি অতি উৎসাহ বোধ করছেন এবং বিশ্বাস করেন যে নারী উন্নয়নে এ প্রেক্ষাপট অত্যন্ত উজ্জ্বল। তিনি প্রবন্ধে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান কোথায় এবং কোন পর্যায়ের তা উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ করেন। পুরুষ ব্যতীত সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের

অধস্তনতার প্রাচীন ইতিহাস যা আজও বিদ্যমান তা তিনি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। ধর্মীয় অনুশাসন এবং উত্তরাধিকার আইনের মত সংবেদনশীল বিষয় তিনি সাবলীলভাবে তাঁর প্রবন্ধে উপস্থাপন করেন। এছাড়াও নারীদের পারিশ্রমিক বিহীন শ্রম এবং শ্রম মজুরির বৈষম্য থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি সকল বিষয়ে বৈষম্যের কথা তিনি তুলে ধরেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের দুর্বল অবস্থান এবং আমলাতন্ত্রে নারীদের অনুপস্থিতি নারীর ক্ষমতায়নের পথে বিশাল বাধা বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ২০০৪ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালা থেকে সম্পদ ও অংশীদারিত্ব শব্দ দু'টি বাদ দেয়া হয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে রাষ্ট্রদূতসহ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, বিচার বিভাগের উচ্চ পদে নারী নিয়োগ সংক্রান্ত ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে। তাই নারীর অধিকার খর্বকারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টন আইনের সংশোধন প্রয়োজন। তিনি সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য অভিন্ন পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইন প্রণয়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করে নয় বরং সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব এবং এর জন্য প্রয়োজন গোটা সমাজব্যবস্থার এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, দর্শন ও মানসিকতার আমূল পরিবর্তন। তিনি আরো বলেন, নারী তথা গোটা সমাজের মুক্তির প্রথম ও প্রধান শত্রু হচ্ছে বৈষম্যমূলক, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। তাই শোষণ-বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান অংশগ্রহণমূলক সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

সভায় দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপক জনাব সেলিনা শরীফ। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা'। বক্তব্যের শুরুতে তিনি অধ্যাপক জাহেদা আহমদ-কে সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীদের অবস্থান এবং এ প্রেক্ষাপটে নারীদের ভূমিকা সম্বলিত তথ্যবহুল উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ জানান। পরবর্তীতে জনাব সেলিনা শরীফ তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত সকল ঋণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করেন।

তিনি উল্লেখ করেন, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ১৯৯০ সাল থেকে সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে উপকারভোগী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচি এবং প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে যা পিকেএসএফ-এর অন্যতম অর্জন। সাম্প্রতিক 'সমৃদ্ধি' কার্যক্রমের পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন মডেলেও মূল প্রতিনিধি হিসেবে নারীকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন যে, বর্তমানে পিকেএসএফ-এর মোট উপকারভোগীদের ৮৯.৭৪% নারী এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত যে, নারী ঋণগ্রহীতারা নিজ অধিকার সম্পর্কে অধিক সচেতন এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন গবেষণা হতে দেখা যায় যে, নারীদের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ তাদের জন্য সম্মানজনক একটি সামাজিক অবস্থান সৃষ্টি করেছে। পাশাপাশি তাদের নিজেদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা এবং আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করছে। সবশেষে তিনি বলেন যে, পিকেএসএফ নারীদের লক্ষ্যভুক্ত করে সকল প্রকার সুযোগ সৃষ্টি এবং সুযোগ গ্রহণের স্বাধীনতা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও করবে।

প্রবন্ধ উপস্থাপনার পর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক হান্নানা বেগম প্রবন্ধ উপস্থাপকদ্বয়ের সাবলীল এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে স্মরণ করেন নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ ক্লারা জেটকিনকে। তিনি বলেন, ক্লারা জেটকিন বিশ্বে উপনিবেশবাদ থেকে শুরু করে যতরকম জঞ্জাল আছে তা দূর করার জন্য নারীর উপর নির্ভর করেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের নারীদের পিছিয়ে থাকার মূল কারণ মজুরিবিহীন শ্রম যার কোন মূল্যায়ন হয় না। যদিও কৃষিতে কিছু উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে এখনও উত্তরাধিকার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। এজন্য নারীদের প্রস্তুত হতে হবে এবং বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কার্যক্রম সম্পর্কে যে ধারণা পেয়েছেন তা থেকে তিনি আশাবাদী যে এ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে নারীদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে এবং এজন্য প্রয়োজন সদ্বিচ্ছা এবং সঠিক উদ্যোগ।

সোপিরেট-এর নির্বাহী প্রধান প্রফেসর এম. মোসলেহ উদ্দীন বলেন, লিঙ্গ বৈষম্যের উৎপত্তি খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন করা। যুগ যুগ ধরে নারীরা নিজেদের অংশ পুরুষদের জন্য ত্যাগে অভ্যস্ত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য সকল ক্ষেত্রে ছেলেরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এমনকি মহিলারা নিজ আয় পুরুষদের হাতে তুলে দিতে অভ্যস্ত, এক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রয়োজন। অনেক অগ্রগতি হয়েছে সত্যি কিন্তু আরো অনেক পথ যেতে হবে। শেষে তিনি দুইজন প্রাবন্ধিককে ধন্যবাদ জানিয়ে বাংলাদেশের ১.৬২ কোটি নারী শ্রমিকদের তথ্য সংরক্ষণ এবং সমাজ ও দেশের উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকা মূল্যায়নের লক্ষ্যে গবেষণা করার প্রয়োজনীতার বিষয়টি উল্লেখ করেন।

চট্টগ্রামের সহযোগী সংস্থা প্রত্যাশী-এর সদস্য জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, তিনি এই সেমিনারে উপস্থিত হতে পেরে গর্বিত। তিনি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা সেমিনারে উপস্থিত সকলের সাথে বিনিময় করেন। তিনি বলেন যে, এমন এক পরিবারে তাঁর জন্ম যেখানে মেয়ে মানুষই অভিশাপ। অনেক কষ্টে এইচ.এস.সি পাশ করলেও তাঁর বিয়ে হয় এমন একজনের সাথে যে কন্যা সন্তানের দায়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে। সমাজে তাঁর পরিচয় হয় পরিত্যক্তা নারী হিসেবে যাকে কেউ মানুষ হিসেবে গণ্য করত না। এমতাবস্থায় ২০০৪ সালে তিনি প্রত্যাশী থেকে সহায়তা লাভ করেন। তিনি বলেন, প্রত্যাশী শুধু আর্থিক সহযোগিতা নয় বরং উপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং মানসিক বিকাশের মাধ্যমে তাঁকে প্রস্তুত করেছে, যার ফলশ্রুতিতে তিনি আজ এখানে উপস্থিত হতে পেরেছেন। তিনি বলেন, শুধু অধিকার আদায় নয় বরং এর সাথে বাচ্চাদের মানসিক বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। স্কুলে শিক্ষার পাশাপাশি সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

সহযোগী সংস্থা শক্তি ফাউন্ডেশন-এর সদস্য অষ্টমী রাণী তাঁর অভাব এবং অভাব জয়ের অভিজ্ঞতা সকলের সাথে বিনিময় করেন। জুতা বিক্রির মাধ্যমে নিজ ভাগ্য পরিবর্তনের গল্প বলতে গিয়ে অষ্টমী আবেগে কেঁদে ফেলেন। বর্তমানে মেয়ের জামাই-এর সহযোগিতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে তিনি জুতা সরবরাহ করেন বলে জানান।

সহযোগী সংস্থা পিএমকে-এর সদস্য মোসাম্মাৎ সখিনা বেগম বলেন, ১৯৯৩ সালে ২ টাকা সঞ্চয়ের মাধ্যমে তিনি যাত্রা শুরু করেন। সর্বপ্রথম ৩০০০ টাকা ঋণ নিয়ে ১৪টি মুরগি কেনেন। পরবর্তীতে কয়েক দফায় পিএমকে-এর নিকট থেকে ঋণ নিয়ে আজ তিনি একটি বড় মুরগির খামার এবং একটি মিনি গার্মেন্টস-এর মালিক হয়েছেন। তিনি সকল নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, নিজেদের আর অবহেলিত ভাববেন না, দুর্বল ভাববেন না। সবাইকে স্বনির্ভর হতে হবে এবং অন্য নারীদের জন্য উদাহরণ স্থাপন করতে হবে।

অতঃপর মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র-এর সদস্য মোছা কায়মা খাতুন তাঁর অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। বেকার স্বামীর সংসারে অভাবের তাড়নায় সংস্থা থেকে ৩০০০ টাকা ঋণ নিয়ে প্রথমে শিকা তৈরি ও পরে ছাগল পালন শুরু করেন। ছাগল বিক্রি করে স্বামীকে রিকশা কিনে দেন। পরবর্তী কালে অধিক ঋণ নিয়ে গাভী পালনের পাশাপাশি দুধের ব্যবসা শুরু করেন। গরু বিক্রি করে তিনি এখন স্বামীকে একটি ট্রাক্টর কিনে দিয়েছেন। এখন তাঁর ছেলেরা স্কুলে যেতে পারে, নিজের আয়ে জমি কিনেছেন। সাংসারিক এবং ব্যবসায়িক কাজকর্মের পাশাপাশি তিনি পড়াশুনা চালিয়ে এইচ.এস.সি পাস করেছেন। আজ সংসারে তাঁর মতামতের মূল্য ও মর্যাদা বেড়েছে।

সহযোগী সংস্থা আরবান-এর নির্বাহী প্রধান জনাব কামালউদ্দিন বলেন যে, পুরুষ হিসেবে তিনি নারী বান্ধব কিনা তা বলতে পারবে তাঁর পরিবারের সদস্য এবং সহকর্মীগণ। তিনি আরো বলেন যে, মার্চ একটি ঐতিহাসিক মাস, বাংলাদেশের জন্য এবং সকল নারীদের জন্য। তিনি প্রফেসর জাহেদা আহমদকে সুলিখিত প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আয়োজকদেরও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, ঋণ গ্রহীতাদের ৯০% নারী হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ২৪টি সহযোগী সংস্থা নারী প্রধান এ বিষয়টি বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

প্রত্যাশীর নির্বাহী প্রধান জনাব মনোয়ারা বেগম, প্রফেসর জাহেদা বেগমের বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধের জন্য সকলের পক্ষ হতে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি বিষয়ে মন্তব্য করেন যে, ছুটিকালীন সময়ে মহিলাদের দক্ষতা ধরে রাখার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও তিনি বলেন যে, আইন প্রণয়নের পাশাপাশি তা প্রয়োগের যথাযথ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তিনি পিকেএসএফ-এর নারী দ্বারা পরিচালিত সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধানগণের সমন্বয়ে একটি পৃথক forum গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, আন্দোলন বা যুদ্ধ নয় বরং নিজেদের পরিচর্যা করে এমন পর্যায়ে নিতে হবে যাতে নারীরা নিজ অধিকার আদায় নিজেরাই করে নিতে পারে। তিনি আরো বলেন যে, পুরুষদের একটি ধারণা রয়েছে যে মেয়েরা কিছু পারেন না বা যা করেন ভুল করেন। ক্লারা জেটকিন নিজের কর্মের দ্বারা এটিকে অসত্য বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি পিকেএসএফ-এর নারী ভাবনাকে স্বাগত জানান এবং নারীদের উন্নয়নের কাজে আরো বেশি করে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান।

এ পর্যায়ে ড. প্রতিমা পাল মজুমদার বলেন যে, মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকা অবস্থায় মহিলাদের কর্মদক্ষতা ধরে রাখা এবং তা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তি উন্নয়ন। এতে করে ঘরে বসে মহিলারা কাজ এবং দক্ষতা উন্নয়ন করতে সক্ষম হতে পারে।

শ্রীমতি বীথি রানী সরকার, সদস্য এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি), বলেন যে বিয়ের পর তিনি সন্তানদের শিক্ষা, চিন্তা এবং সচেতনতা সৃষ্টি করতে গিয়ে সমাজের বাধার সম্মুখীন হন। সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে আজ তিনি নিজে অত্যন্ত সফলতার সাথে ডালের বড়ি ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ডালের বড়ি বিক্রি করার জন্য তিনি তাঁর স্বামীকে একটি সাইকেল কিনে দিয়েছেন। পারিবারিক নির্যাতন এবং বিরূপ মন্তব্যের শিকার হয়েও তিনি হাল না ছেড়ে ঋণ নিয়ে নিজ ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। নিজ এলাকায় শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য উৎসাহ দিয়ে আসছেন।

মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র -এর নির্বাহী প্রধান জনাব রাজিয়া হোসেন বলেন, ১৯১০ সালের ৮ মার্চ থেকে নারী দিবস

পালিত হয়ে আসছে কিন্তু অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও একই অবস্থায় রয়েছে। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া দেশের সর্বত্র মজুরি বৈষম্য বিদ্যমান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে এবং মাঠ পর্যায়ে কাজ করা প্রয়োজন। নিজ ও রাজনৈতিক স্বার্থে মৌলবাদীরা অনেক ক্ষতি করেছে যা নারীর অধিকার আদায়ে বাধা সৃষ্টি করেছে। লিঙ্গ বৈষম্য সম্পর্কে অবহিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে ধারণা সম্বলিত পাঠ সংযোজন করা প্রয়োজন। তাছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মহিলা জনগোষ্ঠীর মাঝে এতদ্বিষয়ক সম্যক ধারণা প্রদান করা সম্ভব। পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সাপ্তাহিক সভায় লিঙ্গ বৈষম্যকে ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে শুরু থেকে কাজ করে আসছে। এটি আরো কার্যকরীকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে পিকেএসএফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের সদস্য জনাব মাজেদা শওকত আলী সকলকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন যে, পিকেএসএফ আজ সুযোগ করে দিয়েছে সকলের সাথে মিলিত এবং পরিচিত হওয়ার। নারীদের নিয়ে পিকেএসএফ-এর ভাবনা অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের বিষয়। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন যে, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ে সামাজিক অনেক বাধা রয়েছে। এ বিষয়ে সচেতনতার সাথে কঠোর অবস্থান নেয়া প্রয়োজন। নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে তিনি বলেন, অনেক বাধা এবং বিপত্তি আসবে কিন্তু মেয়েদের এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা এবং চাকরির চেষ্টা করতে হবে, স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বহু পথ পাড়ি দিতে হবে।

শক্তি ফাউন্ডেশন-এর নির্বাহী প্রধান ড. হুমায়রা ইসলাম বলেন যে, পিকেএসএফ এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে সবাইকে একসাথে কাজ করার একটি platform দিয়েছে। তিনি বলেন যে, ৮ই মার্চ একটি আহ্বান এবং স্বীকৃতি যে মহিলাদের মধ্যে শক্তি আছে। সভায় উপস্থিত প্রতিটি নারীকে বর্তমান অবস্থানে আসার জন্য নিজের সাথে হোক বা পরিবারের সাথেই হোক অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। অষ্টমীর মত প্রতিটি নারীর একটি গল্প আছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এদেশে নারীদের সুযোগ তুলনামূলক কম। একটি জায়গায় এসে অষ্টমীর মত নারীরা আটকে যায়। সেখানেই পিকেএসএফ-কে কাজ করতে হবে। বাজার ব্যবস্থায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ, মহিলাদের স্বাস্থ্য সমস্যা এবং পরিপূরক সেবাসমূহ যেমন শিক্ষা ইত্যাদিকে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে।

এ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, পিকেএসএফ শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবছে কেননা শিক্ষা, স্বাস্থ্য মানুষকে ক্ষমতায়িত করে থাকে। পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচি এই ভাবনারই ফসল। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফাউণ্ডেশন ২টি তহবিল গঠন করেছে, এর একটি হলো 'কর্মসূচি সহায়ক তহবিল' এবং অন্যটি 'বিশেষ তহবিল'। এ তহবিল দু'টি হতে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা বহির্ভূত সদস্যদেরও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, প্রতিটি সহযোগী সংস্থায় এই ধরনের তহবিল গঠন করা প্রয়োজন।

পাবনা প্রতিশ্রুতি-এর নির্বাহী প্রধান জনাব মমতা চাকলাদার বলেন PKSF-এর সহযোগী সংস্থা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলা নির্বাহী প্রধান দ্বারা পরিচালিত সংস্থাসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করার অনুরোধ জানান। এক্ষেত্রে নিয়মনীতির ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা বজায় রেখে প্রয়োজনে পরিচর্যা করে সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ

করেন। তিনি পিকেএসএফ-এর ঋণ খেলাপীদের মধ্যে নারী প্রধান পরিচালিত সংস্থাগুলো নেই বলে উল্লেখ করেন। পরবর্তী সময় তিনি পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম পরিচালনায় স্বচ্ছতার বিষয়টি সেমিনারে তুলে ধরেন।

এ প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, PKSF-এর স্বচ্ছতা সর্বজন স্বীকৃত এবং এটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি বিশাল অর্জন। তিনি আরো বলেন, পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টি বিবেচনা করে পরিবেশের পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক হতে প্রাপ্ত তহবিলের শতকরা ১০ ভাগ অর্থ পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। এরই সূত্র ধরে এ তহবিলের বাংলাদেশ সরকারের শতকরা ৯০ ভাগ অর্থও পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার বিষয়টি আলোচনা করা হচ্ছে।

আরডিআরএস বাংলাদেশ-এর একজন উপকারভোগী বলেন যে, ৩০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তিনি হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন কিন্তু বর্তমানে তাঁর ঋণের পরিমাণ মোট ৫ লক্ষ টাকা। এছাড়া ১৮টি গাভী, ২০০০ মুরগি এবং ১ বিঘা জমিতে চাষাবাদ আছে তাঁর। মৎস্য খাবার এবং গবাদি পশুর খাবার দোকান দিয়েছেন। সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। তাঁর ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাষ্টার্স পাশ করেছে। এই সকল অর্জনের জন্য তিনি আরডিআরএস সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আরডিআরএস বাংলাদেশ -এর হেড অব উইমেন রাইটস জনাব মঞ্জুশ্রী সাহা বলেন যে, নারী প্রধান সভা মূল কথা নয় বরং পুরুষদের বেশি অংশগ্রহণ প্রয়োজন। নারী বা পুরুষ কোন বিষয় নয় কারণ সুযোগ পেলে নারীরা কাজ করতে পারে তা আজ প্রমাণিত। তিনি পিকেএসএফ-কে নারী বান্ধব প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যে, আরডিআরএস -এর ৮৮% উপকারভোগী হচ্ছে মহিলা এবং ঋণ ফেরৎ দেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থা টেকসই হওয়ার মূল কারণ নারীদের অধিক অংশগ্রহণ। তিনি বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের প্রধান সমস্যা উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ এবং বাজারে নারী বান্ধব পরিবেশের বড় অভাব। তিনি বলেন যে, সরকার যে মহিলা Chamber of Commerce গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন তার স্থানীয় পর্যায়ে শক্ত network এবং বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রেও network তৈরি করা প্রয়োজন। বাজারে নারীবান্ধব পরিবেশ প্রয়োজন। পুরুষদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি। সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং নারী নির্যাতন রোধে সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন।

পল্লী মঙ্গল কর্মসূচি-এর নির্বাহী প্রধান জনাব কামরুন নাহার বলেন যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের ৫% সুদে ৫০ জন সদস্যকে গৃহঋণ প্রদানের লক্ষ্যে গৃহায়ণ প্রকল্প গ্রহণ করি। এক্ষেত্রে গৃহঋণ প্রদানের শর্ত হিসেবে ঋণ গ্রহণকারী মহিলা সদস্যদের জমির মালিকানা প্রদানের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করার প্রেক্ষিতে আর কোন আবেদনপত্র দাখিল হয়নি। পরবর্তীতে motivation-এর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক সদস্যকে এ ঋণ প্রদান করা সম্ভব হয়েছিল। এ থেকে মহিলাদের জমি বা সম্পদের মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্রে পুরুষদের অনীহার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে। সুতরাং আর্থিক সহযোগিতাই নারীর ক্ষমতায়নের একটি প্রধান অনুষঙ্গ।

এ প্রসঙ্গে পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, শুধুমাত্র একটি অনুষদ অর্থাৎ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে একটি পরিবারের সমন্বিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রতিটি পরিবারের সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অর্থের পাশাপাশি প্রয়োজন টেকসই প্রযুক্তিসহ স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় যথাযথ অভিগম্যতা।

সাজেদা ফাউন্ডেশন-এর প্রতিনিধি বলেন যে, ক্ষুদ্রবীমা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে কাজের অনেক সুযোগ রয়েছে, বিশেষত স্বাস্থ্যবীমা। কম্যুনিটি স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন যাতে করে কার্যকর এবং টেকসই উন্নয়ন হয়।

সাজেদা ফাউন্ডেশন-এর কো-অর্ডিনেটর জনাব ইয়াসমিন আক্তার বৃষ্টি বলেন যে, তাঁদের প্রতিষ্ঠানে মোট ৯০৫ জন নারী সদস্য হলেও তাঁদের সাথে কাজ করার জন্য নারী কর্মী তুলনামূলকভাবে কম, কারণ কর্মক্ষেত্রে যথাযথ পরিবেশের অভাব এবং কাজের সময় অনির্দিষ্ট। এক্ষেত্রে RDRS কিছু initiative নিয়েছে, যেমন আবাসন সুবিধা, নারীদের নিয়োগের অগ্রাধিকার, সুনির্দিষ্ট কাজের সময়সীমা, নারী স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি। কর্মক্ষেত্রে এ সকল বিষয়সমূহ নিশ্চিত করা গেলে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। তাছাড়া, সংস্থা দ্বারা পরিচালিত স্বাস্থ্য কর্মসূচিতে মহিলাদের শতভাগ নিয়োগ দেয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করার অনুরোধ জানান।

ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফাইন্যান্স-এর অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাহী প্রধান জনাব মোসলেহউদ্দিন সাদেক বলেন যে, আজকের অনুষ্ঠান পিকেএসএফ-এর জন্য একটি মাইলফলক। নারীদের অধিক সচেতন হতে হবে এবং নারীদের চেতনা একটি বিশেষ দিন নির্ভর না হয়ে সারাবছর পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে সাপ্তাহিক সভায় নারী অধিকার বিষয়ক শিক্ষা সংযোজন একটি ভাল উপায় হতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র-এর সাইদা রোকসানা খান বলেন যে, প্রত্যেক সংস্থায় পদমর্যাদা অনুসারে নারীদের অংশগ্রহণ দৃশ্যত হওয়া প্রয়োজন। তিনি পিকেএসএফ-এ একটি শিশু লালন কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব করেন।

পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. প্রতিমা পাল মজুমদার অধ্যাপক জাহেদা আহমেদ-এর উপস্থাপিত প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জানান। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, অধ্যাপক জাহেদা আহমদ তাঁর উপস্থাপনায় নারীদের অধস্তনতার শুরুর দিকটা তুলে নিয়ে আসলে ভালো হতো যা তিনি খুব ভালোভাবে অবহিত। তিনি বলেন, নারীদের অধস্তনতার শুরু উত্তরাধিকার আইন থেকে এবং এক্ষেত্রে বিশেষ করণীয় হল যে, কিভাবে নারীদের উত্তরাধিকার দেয়া যায়। এছাড়া নারীদের অংশগ্রহণের স্বীকৃতি নেই, এ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে কাজ করা প্রয়োজন। যেমন- নারী কৃষকদের মধ্যে কৃষক কার্ড বিতরণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি পুঁজি গঠনে সুযোগ সুবিধা দেয়া এবং তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা। শিক্ষা ব্যবস্থায় লিঙ্গ বিষয়ক পাঠের অন্তর্ভুক্তিকরণ। শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন নয় বরং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সুযোগ গ্রহণের পরিবেশ প্রস্তুত করতে হবে।

দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র-এর প্রধান নির্বাহী জনাব মাসুদুল কাদের বলেন যে, অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব এবং আমাদের প্রতিষ্ঠান শুরু থেকে এলক্ষ্যে কাজ করে আসছে। গবেষণায় প্রমাণিত যে, শতকরা ৫৬ ভাগ নারী ঋণ গ্রহণ করে কিন্তু নিজে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে না যা এক ধরনের পদ্ধতিগত দুর্বলতা। বাজারব্যবস্থার অভাবের প্রধান কারণ মহিলারা উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার কারণে বাজারে যেতে পারে না। তিনি আরো বলেন যে, দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র শতকরা ৫১ ভাগ নারী নিয়োগ করেছে যা একটি বিশাল অর্জন। সকলের এ ক্ষেত্রে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। পাশাপাশি সংস্থার উর্ধ্বতন পর্যায়ে নারীদের নিয়োগ এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব নাহিদা সুলতানা বলেন যে, দক্ষ হাতে অর্থ দেয়া প্রয়োজন সুতরাং প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। পুরুষদের সাথেই কাজ করতে হবে। সুতরাং পুরুষদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। আজকের সেমিনারে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ কতটুকু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হল তা আগামী বৎসর অনুষ্ঠিতব্য সেমিনারে দেখা প্রয়োজন।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র-এর নির্বাহী প্রধান জনাব আলতাফুন্নেসা বলেন যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ পরবর্তীকাল হতেই আমরা মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। পরবর্তীতে কৃষি, প্যারামেডিক্স থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক পর্যায়ে গাড়ি, বেবিট্যাক্সি, ট্রাক্টর চালক, কাঠমিস্ত্রি ইত্যাদি পেশায় মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। আমরা মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কাজ করি এবং প্রতিটি জেলায় এ ধরনের কাজ হওয়া প্রয়োজন। তিনি সকলকে আহ্বান করেন, যে সকল মেয়েদের কাজ নেই বা কাজের সুযোগ পাচ্ছে না তাদেরকে যাতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

সজাগ-এর নির্বাহী প্রধান জনাব আব্দুল মতিন বলেন যে, হাল ছাড়া যাবে না, সমতার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। অধিকার কেউ দেয় না বরং আদায় করে নিতে হয়। আজকের সেমিনারের সবার কথা সবাইকে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপক ফারজানা হামিদ বলেন যে, পিকেএসএফ একটি নারী বান্ধব প্রতিষ্ঠান। এখানে পদোন্নতি, দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ সকল বিষয়ে পিকেএসএফ নারীদের সমান সুযোগ প্রদান করে থাকে। এই ধরনের ব্যবস্থা প্রতিটি সহযোগী সংস্থায় থাকা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, বাংলাদেশে ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

ডরপ-এর নির্বাহী প্রধান জনাব এ.এইচ.এম. নোমান বলেন যে, আজকে যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা একটি চলমান প্রক্রিয়া। বাল্যবিবাহ রোধ, পরিবার পরিকল্পনা এবং মাতৃত্বকালীন ভাতা বিষয়ে উন্নয়ন প্রয়োজন।

লিফট-এর সদস্য জনাব রেবেকা সুলতানা বলেন যে, সহযোগী সংস্থা না হয়েও যে সুযোগ তিনি পেয়েছেন তার জন্য পিকেএসএফ-কে ধন্যবাদ। পিকেএসএফ-এর জন্য আজ তিনি সফলতা পেয়েছেন, নারী হিসেবে কৃষিতে অবদান রাখতে পারছেন। তিনি নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করার সুযোগ চেয়ে আবেদন করেন এবং পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজের সুযোগ চান।

টিএমএসএস-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব নাসিমা আক্তার জলি উদ্যোক্তাদের সেমিনার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে কিছু সুপারিশ করেন। আজকের সেমিনারের সুপারিশমালা জাতীয় পর্যায়ে প্রেরণ এবং নারী উপকারভোগীদের সাফল্যকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পিকেএসএফ-কে আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন যে, সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং উত্তরাধিকার আইনে সুনির্দিষ্টতা প্রয়োজন। এছাড়াও তিনি মন্তব্য করেন যে, লিঙ্গ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যকরীকরণের লক্ষ্যে নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন ।

মুক্ত আলোচনাপর্ব শেষে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেন যে, আজকের এই অনুষ্ঠানের কৃতিত্বের দাবীদার পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয় এবং এ জন্য তিনি সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন

করেন। প্রফেসর জাহেদা আহমদের প্রবন্ধের বিষয়ে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, প্রবন্ধের সুগভীর ভাব এবং বিষয়বস্তুর তাৎপর্য লেখকের বুদ্ধিমত্তার এবং জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। তিনি আরো বলেন যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন এবং এটি অত্যন্ত জটিল একটি বিষয় যা সময় সাপেক্ষ। তিনি আরো বলেন যে, শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ সম্ভব নয় বরং অন্যান্য সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক বিচ্যুতিসমূহ দূর করা সম্ভবপর হবে।

এ পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর সভাপতি মহোদয় বলেন যে, আজকের সেমিনারে অসংখ্য সুপারিশ এসেছে তা প্রতিবেদন আকারে শীঘ্রই লিপিবদ্ধ করা হবে। তিনি সকলকে তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে প্রেরণের বিষয়ে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন, কিছু বিষয়ে পিকেএসএফ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম আবার কিছু বিষয়ে সহযোগী সংস্থাদের দায়িত্ব গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে দায়-দায়িত্বটা ভিন্ন হতে পারে তবে লক্ষ্যটা এক হতে হবে। এরপর তিনি এ সেমিনারে আলোচিত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কিছু সুপারিশ প্রদান করেন।

- সহযোগী সংস্থা এবং পিকেএসএফ পর্যায়ে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আচরণবিধির প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করেন।
- প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করা এবং নারী কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করাসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ সম্প্রসারণ করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ প্রদান করেন।
- সহযোগী সংস্থাসমূহ দ্বারা পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমসমূহ মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এটি কি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে নাকি অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ আদায় করছে তা দেখতে হবে। যদি মুনাফা অর্জন হয় তাহলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা, না বাড়লে কোথায় সুযোগ রয়েছে সেগুলো খুঁজে বের করা দরকার। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন হচ্ছে কিনা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে কিনা সে বিষয়গুলোও খুঁজে বের করা দরকার।
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য কার্যক্রমে নারী নিয়োগ হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে পিকেএসএফ-এর বিশেষ তহবিল থেকে ১৮৬ জনকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এর মধ্যে ৬৮ জনই ছিল মেয়ে শিক্ষার্থী। আগামীতে আরো বেশিসংখ্যক নারীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যকরী ভূমিকার প্রয়োজন রয়েছে কারণ মনোন্নয়নের দায়ভার প্রাথমিকভাবে সহযোগী সংস্থাসমূহের।
- নারী উদ্যোক্তাদের সম্মানিত এবং উৎসাহিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং ভবিষ্যতে সহযোগী সংস্থাদের performance award দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
- নারী দ্বারা পরিচালিত সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধানগণের সমন্বয়ে সংগঠন তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে উদ্যোগটা সহযোগী সংস্থার মধ্য থেকে আসতে হবে।

সবশেষে তিনি বলেন যে, আজকের সেমিনার হল একটি নব সূচনা এবং সবাইকে উৎসাহের সাথে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি সকল সহযোগী সংস্থাকে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়ে যার যার অবস্থান থেকে আলোচনা করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন যে, সকল সমস্যার সমাধান একদিনে সম্ভব নয় কিন্তু কাজ করে যেতে হবে। অনেক পথ পাড়ি দিয়ে আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছি এবং আরো অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

নারী উন্নয়ন ভাবনা: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

জাহেদা আহমদ
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চারটি দশক পেরিয়ে এসেছি আমরা। এদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। তাই এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সার্বিক, সুষম, প্রকৃত উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত অবশ্যই। আর এই যে নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী ও শিশু নিয়ে গঠিত বর্তমান ১৬ কোটি মানুষের যে বিশাল সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের – একুশ শতকের ১১টি বর্ষ পেরিয়ে আসা সেই রাষ্ট্রে বর্তমানে নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থান কেমন – কোন পর্যায়ে তা?

বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব প্রাপ্ত ও স্বীকৃত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। এইলক্ষ্যে যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই কবে – বিশ শতকের মধ্যভাগেই, বলা যায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যেই। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন সংগ্রাম ক্রমশ এগিয়ে গেছে নতুন, স্বাধীন-সার্বভৌম সেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যা আমরা পেলাম এখন থেকে চার দশক আগে।

বিগত চার দশকে এদেশের নারী সমাজের ভাগ্যে উন্নয়ন-অনুন্নয়নের চিত্র বিশ্লেষণে যাবার আগে এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটুকু একটু দেখে নিই। আমরা জানি নারীর অধঃস্তনতার বিষয়টি সব সমাজেই অতি প্রাচীন, গভীর ও জটিল। পৃথিবীর বহু দেশেই নারী-পুরুষের বৈষম্য কম-বেশি বিদ্যমান। ব্যতিক্রম নই আমরাও। যুগ-যুগ ধরে নারী শোষিত-বঞ্চিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কূপমণ্ডূকতা, শোষণ-নিপীড়নের প্রকাশ দেখা যায় নানা মাত্রায়, নানারূপে। কঠোরভাবে পুরুষ শাসিত, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান ধর্মীয় অনুশাসন, জ্ঞাতিত্ব (kinship) পরিবার, বিবাহ, উত্তরাধিকার ব্যবস্থা, নারী-পুরুষ পৃথকীকরণ (segregation) ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। একজন বাঙালি মেয়ের জীবনে বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এর সাথে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থানসহ গোটা ভবিষ্যৎ জড়িত হয়ে থাকে। অথচ তার পরাধীনতা এমনই যে এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপারে সে নিজের ইচ্ছানুসারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে খুব কমই। যদিও আইনত তার সেই অধিকার স্বীকৃত। জন্ম থেকে আমৃত্যু বাঙালি মেয়ে প্রথমে পিতা/ভ্রাতার অধীন, বিয়ের পর স্বামীর এবং বেঁচে থাকলে অতঃপর পুত্রের অধীন। সাধারণভাবে এই হচ্ছে বাঙালি মেয়ের জীবনের কঠোর বাস্তবতা।

পুরুষের খবরদারির এ কাজটি সহজতর করার জন্য ধর্মীয় অনুশাসনের ভূমিকাকে খাটো করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। আবহমানকাল থেকেই ধর্ম এদেশে প্রবল পুরুষতন্ত্র তথা নারী-পুরুষ বৈষম্যেও একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে মোল্লাতন্ত্রের শিকার অকাল প্রয়াত গবেষক লেখক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ (১৯৪৭-২০০৪) তাঁর সুলিখিত "নারী" গ্রন্থে ক্ষুরধার আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে "পিতৃতন্ত্রগুলোর মধ্যে মানুষ ও নারীর বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্রে সবচেয়ে নিপুণ হিন্দু পিতৃতন্ত্র। ... ... হিন্দু আইনে নারীর কোনো মূল্য নেই, নারী অস্থাবর সম্পত্তি মাত্র; নারী কোনো সম্পত্তির মালিক হতে পারে না, পারে না সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে" মনুর বিধানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তিনি, যাতে বলা হয়েছে "নারীকে কুমারীকালে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্ররা রক্ষা করবে, নারী কখনোই স্বাধীন থাকার যোগ্য নয়।"

এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান। পিতৃতন্ত্রের প্রভাব এ জনগোষ্ঠীর মধ্যে কম হওয়ার কোনো কারণ নেই। ইসলামের মতে নারী-পুরুষের স্ব-স্ব স্বাভাবিক প্রবণতা, শারীরিক ও কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের কারণে উভয়ের কর্মক্ষেত্র যে কেবল সম্পূর্ণ আলাদা তাই নয়; নারীর উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভুত্বেরও ভিত্তি এটা।

কোরআন শরীফে বলা হয়েছে, "নারীর যাবতীয় ব্যাপার দেখাশোনার দায়িত্ব পুরুষেরই, কারণ আল্লাহ্ অশেষ করুণায় পুরুষকে নারীর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। পুণ্যবতী রমনীরা তাই বরাবরই বাধ্য ও অনুগত। তাঁরা সদা-সর্বদা যথাযথভাবে নিজেদের সম্ভ্রম রক্ষা করে চলেন" (সুরা আহযাব, ৩৩)। নারী পুরুষের ভিত্তিতে পরিবার ও সমাজে মানুষের এই যে কঠোর পৃথকীকরণ এর ফলে মুসলমান সমাজে গড়ে উঠেছে পর্দা তথা অবরোধ প্রথা। এই পৃথকীকরণ ব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক মুসলমান মেয়েদের স্বাধীনতা তথা অধিকার সীমিতকরণের একটি যুক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে যুগ যুগ ধরে।

মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে নির্মোহ, বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন হুমায়ুন আজাদ। তাঁর মতে, "এখন উগ্রতম পিতৃতন্ত্র হচ্ছে মুসলমান পিতৃতন্ত্র। ইসলাম কনিষ্ঠ ধর্ম, এটি ওই অঞ্চলের দু'টি পুরনো ধর্মের উত্তরাধিকার বহন করে অনেকখানি; এ ধর্ম নারীকে দিয়েছে কিছু অধিকার, যা আগের পিতৃতন্ত্রগুলো দেয়নি। তবে ইসলামী পিতৃতন্ত্রেই নারী এখন সবচেয়ে শৃঙ্খলিত, কেননা অন্যান্য পিতৃতন্ত্রগুলোর বিবর্তন ঘটেছে, আর এটি বিবর্তন রোধ করে চলেছে। পুরুষ সম্পর্কে উচ্চ ও নারী সম্পর্কে নিম্ন ধারণা ইসলাম পেয়েছে ইহুদি-খৃষ্টান ঐতিহ্য থেকে এবং তাকে বদ্ধমূল করে তুলেছে"। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম নারীকে কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা দেয় যা অন্য কোনো ধর্ম দেয়নি। বিবাহিত নারীর জন্য রয়েছে দেনমোহরের ব্যবস্থা, স্বামী কর্তৃক ভরণপোষণের দায়িত্ব। শরিয়া অনুসারে কন্যা পিতার সম্পত্তির ও স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে তবে তাদের অংশ কম হয়ে থাকে। শরিয়া আইনে পুরুষের বহু বিবাহ–চার স্ত্রী পর্যন্ত স্বীকৃত। পুরুষ একের পর এক কোনো কারণ না দেখিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। এক্ষেত্রে স্ত্রী শুধু দেনমোহর ছাড়া স্বামীর সম্পত্তির কিছুই পায় না। আর স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিলে দেনমোহরও পায় না। বাংলাদেশে ১৯৬১ সালের (পাকিস্তান আমলে প্রণীত) মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের অধীনে বহুবিবাহ ও তালাক রীতির কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। তবে এ আইনও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেনি, কিছুটা নিয়ন্ত্রণের ও তালাকের ক্ষেত্রে পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা প্রশমনের খানিকটা প্রয়াস পেয়েছে মাত্র।

কিন্তু অর্থনৈতিক বাস্তবতা আরো নিষ্ঠুর, আরো নির্মম যা এ দেশের অধিকাংশ মেয়েদের রুজি-রোজগারের অন্বেষণে ঘরের বাইরে নিয়ে আসে, যদিও অবগুণ্ঠিত, অকুণ্ঠিত বিচরণ তার তেমন থাকে না। এ দেশের মেয়েদের অতি বৃহৎ অংশ শুধু যে দরিদ্র তাই নয়, দারিদ্র্য সীমারেখার সর্বনিম্ন স্তরে এদের অবস্থান। সত্য বটে ঘর-সংসারের কাজে-কর্মে এদেশের মেয়েরা উদয়াস্ত কঠোর পরিশ্রম করে এসেছে এবং এখনও করে–তথাপি তার পুরোটাই পারিশ্রমিকবিহীন। কিন্তু এই একান্ত পারিশ্রমিকবিহীন নারীশ্রমের বাইরে উৎপাদনশীল কাজও তো মেয়েরা করে বিস্তর–যদিও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তার তেমন স্বীকৃতি দেয় না। গ্রামের নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত মেয়েরা পর্দা প্রথার বেশ বাইরে গিয়ে হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজি উৎপাদন, নানাবিধ কুটির শিল্প, শস্যমাড়াই ও গোলাজাতকরণ ইত্যাদি কাজে সক্রিয় রয়েছে। তবে ঘরের বাইরে গিয়ে, এসবের বিপণন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ পর্দাপ্রথার কারণে হয়ে রয়েছে বেশ সীমিত; অনেকক্ষেত্রে প্রায় নেই বললেই চলে। ওই প্রক্রিয়ায় এসে তাদের কর্তৃত্ব আবার চলে আসে পুরুষেরই হাতে, তাদের শ্রম হয়ে যায় মূল্যহীন। এক হিসাব অনুযায়ী এ ধরনের কাজে দুই থেকে তিন কোটি মেয়ে জড়িত রয়েছে, যাদের শ্রমে ও ঘামে সমাজের চাকা সচল রয়েছে সর্বদা।

এর প্রতিফলন সরকারি দলিল দস্তাবেজে আজও যথাযথভাবে ঘটেনি। ১৯৮১ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী নারী শ্রমিকদের মোট হার ছিল মোট শ্রমজীবীদের মাত্র ৪.৩ শতাংশ। পরে বিভিন্ন মহলের চাপের মুখে সরকার মেয়েদের কাজের সংজ্ঞায় কিছুটা পরিবর্তন করেছে। তবে এখনও কর্মক্ষম পুরুষদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ ৮৬ শতাংশ আর কর্মক্ষম নারীদের মাত্র ২৯ শতাংশ – সরকারি তথ্যে তাই দেখা যায়। বাকি নারীদের কাজের কোনো স্বীকৃতি নেই। এদের কাজের মূল্যায়ন করা হলে জাতীয় আয় অনেক বেশি বলে দেখা যেত। কিন্তু তারা থেকে যাচ্ছেন অপাংক্তেয়। এছাড়া মেয়েরা সমান অথবা বেশি শ্রম দিয়েও পুরুষের তুলনায় পারিশ্রমিক পায় কম। এটা গ্রামীণ, সংগঠিত-অসংগঠিত (Informal/Formal) শিল্প কল-কারখানা সব ধরনের কাজের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এরকমটি উন্নত বিশ্বেও বিদ্যমান।

ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা, গ্রামাঞ্চল থেকে রোজগারের সন্ধানে শহরে চলে আসা, শিল্প-কারখানা এবং বিশেষ করে পোশাক শিল্পের প্রসার ইত্যাদি কারণে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। কৃষিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মোট মহিলা শ্রমিকের কম-বেশি ৪০ শতাংশ কর্মরত হলেও এদের ৭০-৭৫ শতাংশই পারিশ্রমিকবিহীন অর্থাৎ পারিবারিক ভিত্তিতে শ্রমে নিযুক্ত। আর শিল্পে মেয়েদের সবচেয়ে বেশি সমাবেশ ঘটেছে পোশাক কারখানায়– এই শিল্পে মোট শ্রমজীবীর ৯০ শতাংশই নারী। কিন্তু কৃষিই বলি আর শিল্প বা গৃহস্থালীর কাজই বলি–সর্বত্রই পুরুষের

তুলনায় মেয়েরা শোষিত বঞ্চিত হয় বেশি। এরা খাটে বেশি, মজুরি পায় কম, অধিকার সচেতনতা এদের কম, এদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রায় নেই বললেই চলে, তদুপরি ঘরে-বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই এদের সমান শ্রম দিতে হয়। আর পাশাপাশি উপরি পাওনা হিসেবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নানারকম হয়রানি এমনকি যৌন নির্যাতনের ব্যাপারও রয়েছে।

বৈষম্যের খতিয়ান কিন্তু এখানেই শেষ হয়ে যায়নি। পুরুষকেই যেহেতু সবসময় পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে মনে করা হয়, কাজেই বয়স নির্বিশেষে তুলনামূলকভাবে ভালো ও উপযুক্ত পরিমাণ খাবার তাদের ভাগ্যেই জোটে। পুরুষের তুলনায় প্রয়োজনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ক্যালরি মেয়েরা গ্রহণ করে থাকে। এ ঘাটতির প্রভাব স্বাস্থ্যের ওপর পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই। প্রসূতি মৃত্যুর হার অনেক কমলেও আরো কমা উচিত। স্বাস্থ্য পরিচর্যা গ্রহণের ক্ষেত্রেও নারী প্রকট বৈষম্যের শিকার।

তবে সবচেয়ে বড় বৈষম্য দেখা যায় সন্তানকে শিক্ষাদানের বেলায়। সীমিত আয়ের পরিবারে স্বাভাবিকভাবেই পুত্রের শিক্ষা অগ্রাধিকার পায়। ১৯৮৯ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী ছেলেদের ৯০ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছিল। মেয়েদের বেলায় এ হার ছিল ৫০ শতাংশ। তবে এ ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে অনেক উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের অনুপাত সমান অথবা মেয়েদের বেলায় কিছু বেশি। ঝরে পড়ার হার বছর দুই-তিন আগেও পঞ্চম শ্রেণী শেষ করার আগে ছিল ৪৮ শতাংশ এবং যারা পরবর্তী পর্যায়ে যেত তাদের প্রায় ৪২ শতাংশ ঝরে পড়ত ১০ম শ্রেণী শেষ করার আগে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ঝরে পড়ার হার তুলনামূলকভাবে বেশি। সম্প্রতি সরকারি বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে ঝরে পড়ার হার উভয় পর্যায়ে বেশ কমে এসেছে বলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয়।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু মেয়েরা ছেলেদের থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। এ পর্যায়ে মেয়েদের অনুপাত এক তৃতীয়াংশ। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়লেও বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক কারণে অনেক মেয়ে আর এগুতে পারে না। এবার একটু তাকাই বিভিন্ন পাবলিক সেক্টরে মেয়েদের নিয়োগের ক্ষেত্রে। নীতিগতভাবে সরকার এসব ক্ষেত্রে নিয়োগের বেলা নারী-পুরুষের জন্য সমসুযোগ নীতি অনুসরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সেনাবাহিনী ও পুলিশ সার্ভিসে মেয়েদের নিয়োগ খানিকটা হলেও দেয়া শুরু হয়েছে। সুখের কথা সরকারি পর্যায়ে বেতনসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি সম্প্রতি ছয়মাস করা হয়েছে যা সর্বোচ্চ ধনী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র দেড় মাস। সরকারি প্রতিষ্ঠানে মহিলা চাকরিজীবীদের জন্য দিনের বেলা সন্তান পরিচর্যার লক্ষ্যে Day Care কেন্দ্রও খোলা হয়েছে।

দেখা যাক, নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আমাদের মেয়েদের অবস্থানটা কী ও কোথায়? এ প্রশ্নটি গত তিন দশক ধরে বেশ উচ্চ কণ্ঠে সভা-সমাবেশে, মজলিশে ও গণমাধ্যমে-আলাপ-আলোচনায় চলে আসছে। কেননা সেই ১৯৮০র দশক থেকে এ দেশে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে দু'জন মহিলাকে আমরা পেয়ে এসেছি। যে কথাটা আমরা ভুলে যাই বা ভুলে থাকতে চাই তা হলো তাঁরা শুধু নিজ মেধা, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার কারণে জাতীয় রাজনীতির শীর্ষে চলে এসেছেন একথাটা মোটেই ঠিক নয়। বরং তাঁরা সেই উত্তরাধিকার প্রথারই প্রতিনিধিত্ব করছেন যা নির্ধারিত হয়েছে পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক দলের স্বার্থেই। তার অকাট্য প্রমাণ সংসদে মহিলা আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা যা কি না সবসময়ই ক্ষমতাসীন দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে করে নতুন মহিলা নেতৃত্ব তৃণমূল পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত অনুপাতে সৃষ্টি হতে পারছে না। কারণ, মনোনীত মহিলা সাংসদরা ক্ষমতাসীন দলের লেজুড় হিসেবেই সংসদকে অলংকৃত করে এসেছেন। নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের কোনো সুযোগ তাঁরা পান না। এ কোটা ব্যবস্থা পাকিস্তান আমলেও ছিল, এখনও রয়ে গেছে। এটা দুর্বলতার প্রমাণ, অগ্রগতির নয়। সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সংগঠিত গোষ্ঠী হচ্ছেন আমলারা। দলীয় শাসনের যত অদল-বদলই ঘটুক না কেন আমাদের আমলারা সব সময়েই দোর্দণ্ড প্রতাপে দেশ চালনা করে আসছেন। সেই আমলাদের মধ্যে ক'জন মহিলা পাওয়া যাবে? বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলা আমলাদের সংখ্যা তো হাতে গোনা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০০৫ সালের রিপোর্ট বলছে সরকারি ক্ষেত্রে ১৯৯৪ সালে প্রথম শ্রেণীর মহিলা আমলাদের অনুপাত ছিল ৫.২ এবং ২০০২ সালে তা বেড়ে হয় ৯.৮%। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৬.৮% থেকে বেড়ে হয়েছিল ৭.৮, তৃতীয় শ্রেণীতে ৪.৯% থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১২.৮ এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ৩.১% থেকে হয় ৬.৫%। ওই একই রিপোর্টে সেনাবাহিনীতে ৭৬ জন, বিমানবাহিনীতে ৩৫ জন এবং নৌবাহিনীতে ২০ জন মহিলা পদাধিকারীর খবর রয়েছে। পুলিশ বিভাগে কর্মরত–কর্মকর্তা ও কনস্টেবল মিলিয়ে ১ হাজার ৯২ জন মহিলা। সিভিল সার্ভিসে ৭,৫৭৪ জন এবং পররাষ্ট্র দফতরে ২৬ জন মহিলা কর্মরত ছিলেন। সবমিলে মহিলা কর্মীর অনুপাত ছিল ১০ শতাংশ মাত্র। সচিব পর্যায়ে একজনও মহিলা ছিলেন না। তবে উচ্চ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সম্প্রতি কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে মহিলা সচিব আছেন

মাত্র ৩ জন এবং অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন ৪ জন। রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে রয়েছেন ৩ জন নারী। তবে সার্বিকভাবে এখন সচিবালয়ে মহিলা কর্মীর অনুপাত খুব একটা বাড়েনি।

সংসদে বর্তমানে মোট ৩৫০ জন সদস্যের মধ্যে ৫৯ জন নারী রয়েছেন–এদের মধ্যে মাত্র ৯ জন নির্বাচিত এবং বাকি ৫০ জন মনোনীত। প্রধানমন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রীসভায় আছেন ২ জন নারী পূর্ণ মন্ত্রী এবং ২ জন নারী প্রতিমন্ত্রী। সম্প্রতি দেশের সর্বোচ্চ আদালত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে সর্বপ্রথম নারী বিচারপতি নিয়োগ প্রদান করে নারীর ক্ষমতায়নে নতুন মাইলফলক যুক্ত করেছে। এছাড়াও হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি পদে পাঁচজন নারী এবং বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশনে নারী সদস্য রয়েছেন। গেজেটেড বা সমপদে প্রবেশ পর্যায়ে ১০ শতাংশ ও ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদে প্রবেশ পর্যায়ে ১৫% কোটা নির্দিষ্ট রয়েছে নারীর জন্য। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষকের নিয়োগ ক্ষেত্রে ৬০% ভাগ মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত তবে বাস্তবে তা ঘটছেনা। আর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সম্পূর্ণ নারী সংগঠিত পুলিশ ইউনিট প্রথমবারের মতো হাইতিতে দায়িত্ব পালন করছে। এসকল অগ্রগতি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তবে নারীর সুষম ক্ষমতায়ন এখনও অনেক দূরে থেকে গেছে।

এদেশে মেয়েদের অতি নিম্নস্তরের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান থেকে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে অবশ্যই। আমরা জানি ১৯৭৫ সালের মুসলিম বিবাহ তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন; ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন; ১৯৮৩ সালের নারী নির্যাতন বিরোধী আইন, ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ২০০২ সালের এসিড নিয়ন্ত্রণ ও এসিড অপরাধ দমন আইন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল (২০০২) পাস করা হয়েছে। ২০১১ সালে নারী উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। নির্যাতিত মেয়েদের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে একাধিক নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র। তবে কেবল আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই নারীর অধঃস্তনতার উন্নতি ঘটানো কোনমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও শাসকগোষ্ঠীর একাংশের সদিচ্ছার অভাব যে কত প্রকট তা জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূরীকরণ সনদের (Convention on Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women-CEDAW) আংশিক গ্রহণের দ্বারাই তৎকালীন সরকার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এই CEDAW সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছিল ১৯৮৪ সালে কতকগুলো নির্দিষ্ট ধারা বাদ দিয়ে। ধারা ২ এবং ধারা ১৬.১ (গ) বাংলাদেশ এখনও অনুমোদন করেনি। কী কারণে? ধারা ২-এ বলা হয়েছে, বৈষম্য দূর করে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ এবং ১৬-১ (গ)-এ বলা হয়েছে বিবাহ ও এর বিচ্ছেদকালে নারী পুরুষের একই অধিকার ও দায়িত্ব।

২০০৪ সালে তৎকালীন বিএনপি-জামাত জোট সরকার নারী নীতিতে "সমান" শব্দটি বাদ দিয়ে "সংবিধানসম্মত অধিকার" কথাটি যোগ করে দেয়। তাদের নারী উন্নয়ন নীতিমালায় সম্পদে নারীর অংশীদারিত্বের কথা থাকলেও তা থেকে "সম্পদ ও অংশীদারিত্ব" শব্দ দু'টি বাদ দেয়া হয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশের দূতাবাসগুলোতে রাষ্ট্রদূতসহ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পরিকল্পনা কমিশন, বিচার বিভাগের উচ্চ পদে নারী নিয়োগ সংক্রান্ত ধারাটি বাদ দেয়া হয়েছে। এর কারণ খুঁজতে বেশিদুর যেতে হবে না। তৎকালীন বিএনপি-জামাত জোট সরকার পারিবারিক সম্পত্তিতে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের সমানাধিকার তো মেনে নিতে পারেনি। ওই যে শরিয়া আইনের ব্যাপারটি রয়েছে যাতে সম্পত্তিতে মেয়েদের সমানাধিকার স্বীকার করা হয়নি। কিন্তু এ ব্যাপারটি বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র

পরিচালনার আদর্শ, মূলনীতি এবং মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তার সঙ্গে মেলে না। যেহেতু শরিয়া বা সুন্নাহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি বা আইনের উৎস নয়। তাই বিএনপি-জামাতের যুক্তি আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনা বা পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

মুসলিম পারিবারিক আইনে সম্পত্তিসহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকার স্বীকার করা হয়নি। তাই নারীর অধিকার খর্বকারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তি বণ্টন আইনের সংশোধন প্রয়োজন। আর ইসলামে আইনের সংস্কার চলে না, এমনটা বলা ঠিক নয়। কোরআন আর হাদিস ছাড়াও আরো দু'টি নীতির উপর ইসলামী আইন দাঁড়িয়ে আছে, তা হলো ইজমা ও কিয়াস। ইজমার মূল অর্থ হচ্ছে, মুসলিম পণ্ডিতদের দ্বারা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। অর্থাৎ জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে ন্যায়সঙ্গত সমাধান খুঁজে নেয়া। সিডো-র ১৬.১ (গ) ধারাটির সংরক্ষণ ধর্মীয় কারণে হয়নি। কারণ ইসলাম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদে নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার নিশ্চিত করেছে। এটি মূলত বর্তমান মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রেক্ষিতে করা হয়েছে, যা নারীকে জীবনের নানা ক্ষেত্রে অধস্তন করার কৌশলমাত্র। বাংলাদেশের সংবিধানে আছে যে, আইনের চোখে নারী-পুরুষ সকলেই সমান। তথাপি আমরা জানি যে, এদেশে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারী-পুরুষের বেলায় আইনের ভিন্নতা রয়েছে এবং অনেকক্ষেত্রেই তা মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক–যেমন সম্পত্তি আইন, উত্তরাধিকার আইন, সন্তানের ওপর বাবা-মায়ের অধিকার আইন ইত্যাদি।

তাই এই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে এসে আমাদের প্রয়োজন সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য অভিন্ন পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইন (Uniform Personal Code) প্রণয়ন। বৈষম্য নিরসনের ক্ষেত্রে কেবল আইন প্রণয়নই যথেষ্ট না হলেও এটা প্রথম পদক্ষেপ তো অবশ্যই। বিভিন্ন সময়ে প্রণীত জাতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে নারীর অবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মেয়েরা সম্পূর্ণ উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। মেয়েদের শিক্ষার উন্নতির কথা বলা হয়েছে সুগৃহিণী ও সুমাতা তৈরি করার জন্য, যেন মেয়েদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা কেবল ওই কারণেই। এরপরে ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীনে মহিলা বিভাগ খোলা হয়। তবে তা তেমন কোন অবদান রাখতে পারেনি।

এর পরের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-৮০) ওই সময়ে ৭টি প্রকল্পের ২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল মূলত শহুরে মেয়েদের জন্য। সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থায় ১৫ শতাংশ চাকরির কোটা মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বরাদ্দ রাখা হয় ৩১ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) টাকার অংক বৃদ্ধি করে ৮৮ কোটিতে এবং এতে প্রথমবারের মতো মেয়েদের ওপর একটি আলাদা অধ্যায়ও যোগ করা হয়। পরবর্তীতে বাজেটে নারী উন্নয়নে ব্যয় বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হয়। বিগত দু'বছরে কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের জন্য পৃথক নারী উন্নয়ন বাজেট গ্রহণ করা হয়। চিন্তাধারা ও নীতি গ্রহণে উন্নতি হয়েছে বলা যায়। তবে বাস্তবায়নে ঘাটতি থাকায় কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি।

অবস্থার লক্ষণীয় ফলপ্রসূ উন্নয়ন ঘটাতে হলে গোটা সমাজব্যবস্থা তথা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন ও মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। কারণ বিদ্যমান বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করে মেয়েরা তার নিগড় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে মুক্তি পেতে পারে না। যে সমাজে পুরুষ নিজেই বন্দী সেখানে নারী মুক্তি সম্ভব হবে কিভাবে? যৌতুক প্রথার নির্মম দংশন, নারী নির্যাতন, নারী পাচার, পতিতাবৃত্তির মতো সামাজিক দুষ্টক্ষতের ভয়াবহ ব্যাপ্তি একথাই মনে করিয়ে দেয় যে, নারী তথা গোটা সমাজের মুক্তির প্রথম ও প্রধান শত্রু হচ্ছে বৈষম্যমূলক, শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। ছোট-বড় শত্রু আরো অনেক আছে যাদের সৃজন, লালন-পালনও করে থাকে এ সমাজই। এরা এই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থারই এজেন্ট ও দোসর। মৌলবাদী ও কাঠ মোল্লারা বরাবরই নারী মুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীরাও মেয়েদের পণ্য হিসেবে ব্যবহার করতে মোটেই দ্বিধা করেন না–চলচ্চিত্রে, হোটেলে, বিজ্ঞাপনে এবং আরো নানা ক্ষেত্রে এদের দৌরাত্ম বন্ধ করতে পারে কেবল শোষণ–বৈষম্যহীন, ন্যায়ভিত্তিক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অংশগ্রহণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাই।

এর কোনো বিকল্প নেই, নেই অন্য কোনো পথ নারী মুক্তিরও। সেই সঙ্গে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রেরও।

নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ–এর ভূমিকা

সেলিনা শরীফ
ব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ

ভূমিকা

একটি সমাজ সাফল্যজনকভাবে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারে যদি সেই সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েই নিজেদের জীবন এবং সমাজে অবদান রাখার জন্য সমান সুযোগ পায়। নিজেদের জীবন এবং সমাজে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশে নারীরা বিভিন্ন দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে কারণ বাংলাদেশে নারীদেরকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ (সহিংসতা, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষমতাহীনতা) মোকাবেলা করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এই পিছিয়ে পড়া নারীদেরকেই লক্ষ্যভুক্ত করে পিকেএসএফ তার বহুমুখী কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে যা নারীকে তাঁর সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে দমিয়ে রাখার যে পরিস্থিতি তা মোকাবেলা করার সামর্থ্য ও ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করছে।

পিকেএসএফ-এর কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পিকেএসএফ পল্লী এলাকার বিত্তহীন-ভূমিহীনদের বিশেষ করে মহিলাদের মাঝে সহযোগী সংস্থাদের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ শুরু করে। বর্তমানে পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবার বৈচিত্রায়ন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের অর্থ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। পিকেএসএফ শুরু থেকে এ পর্যন্ত আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করে নারীদেরকে নানাবিধ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ ১৯৯০ সাল থেকে পল্লী এলাকার বিত্তহীন-ভূমিহীনদের মাঝে পুঁজি সরবরাহের জন্য এর সহযোগী সংস্থাদের অর্থায়ন শুরু করে যা পরবর্তীতে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ উপখাত হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় গ্রামের দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে মহিলারা বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগের জন্য স্বল্প তহবিল পেয়ে থাকেন। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মোট ৪২২০৫৫০ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৩৭৭৪৫১৬ জন মহিলা উপকারভোগী অর্থাৎ ৮৯.৪৩% ই নারী উপকারভোগী।

নগর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

১৯৯৯ সাল থেকে পিকেএসএফ পল্লী এলাকার বিত্তহীন-ভূমিহীনদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শহরের দরিদ্রদের মাঝে নগর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা শুরু করে। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মোট ৬,৬৫,৩৯৩ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৬৩৮,৮১৫ জন অর্থাৎ ৯৬ % মহিলা উপকারভোগী।

ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম

পিকেএসএফ ২০০১ সাল থেকে ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে যেখানে উদ্যোক্তার নিজের এবং পরিবারের অন্য সদস্যের পাশাপাশি পরিবার বহির্ভূত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদী ঋণের পাশাপাশি চলতি মূলধন ঋণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত ৩,৭১,৮১২ জন উপকারভোগীর মধ্যে ২,৪৫,৭৬৫ জন মহিলা উপকারভোগী যারা ক্ষুদ্র ব্যবসা, ডিম ও দুধ উৎপাদন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, পোল্ট্রি, মৎস্য চাষ, ফুড প্রসেসিং, নির্মাণ, গার্মেন্টস ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

২০০৪ সাল থেকে পিকেএসএফ অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ভিক্ষুক, মৌসুম নির্ভর শ্রমজীবী বা দিনমজুর; সহায়-সম্পদহীন, যাদের রাত্রি যাপনের জায়গাও নেই; তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা প্রধান পরিবার; শিশু শ্রমিকের পিতা-মাতা ইত্যাদি। এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীরা নানাধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে। অতিদরিদ্র উপকারভোগীদের সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের একটি অন্যতম লক্ষ্য তাঁদের Motivational Support প্রদান করা, যাতে তাঁদের মন-মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তন হয়। পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহের নিরলস প্রচেষ্টার কারণে এ ঋণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সর্ববৃহৎ দলীয় কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মোট ৫২৮৫৮৯ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৫২৭৬৩২ জন মহিলা উপকারভোগী অর্থাৎ ৯৯.৮১% মহিলা উপকারভোগী এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে।

মৌসুমী ঋণ ও কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

পিকেএসএফ ২০০৬ সাল থেকে মৌসুমী ঋণ কর্মসূচি এবং ২০০৮ সাল থেকে কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের খাদ্যশস্য, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, ফলমূল, তরিতরকারি, কৃষিভিত্তিক বন, মাছ চাষ, বিশেষায়িত কৃষি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চাহিদামাফিক ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মৌসুমী ঋণ কর্মসূচিতে মোট ২,০১,২৯১ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১,৭৬,৫০৯ জন অর্থাৎ ৮৭.৬৮% জন মহিলা উপকারভোগী এবং কৃষিখাত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে মোট ২,২৯,৪৪০ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১,৯১,০৬৭ জন অর্থাৎ ৮৩.২৭% মহিলা উপকারভোগী এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে।

PRIME

যে কোন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মৌসুমি দুর্যোগ (যেমন মঙ্গা) এর সময় মহিলারা সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় থাকে। এই দুর্যোগ এর সময় দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের নাজুক অবস্থা লাঘব করার জন্য পিকেএসএফ মঙ্গা হিসেবে পরিচিত মৌসুমি দুর্যোগ নিরসনে ২০০৬ সাল থেকে দুর্যোগপ্রবণ উত্তরবঙ্গে Programmed Initiatives for Monga Eradication (PRIME) নামে একটি কর্মসূচির বাস্তবায়ন করছে। পরবর্তীতে সিডর ও আইলা দুর্গত এলাকায়ও এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মঙ্গাক্রান্ত উত্তরবঙ্গের পরিবারগুলোর জন্য বছরব্যাপী মজুরিভিত্তিক ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, যেখানে প্রায় ৯৯% উপকারভোগীই ছিল মহিলা। এ কর্মসূচির আওতায় মঙ্গাক্রান্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোক্তা ঋণসহ অতি-নমনীয় পদ্ধতির ক্ষুদ্রঋণ, কাজের বিনিময়ে অর্থ, রেমিট্যান্স সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, কারিগরি সহায়তা, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। মঙ্গাক্রান্ত উত্তরবঙ্গ, সিডর ও আইলা দুর্গত এলাকায় PRIME-এর আওতায় 'কাজের বিনিময়ে অর্থ' কর্মসূচিতে এ পর্যন্ত মোট ১,৫৮,৫৫১ জন উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার শতকরা ৯৯ ভাগই মহিলা উপকারভোগী এবং মহিলাদেরকে ঐ অঞ্চলের পুরুষের সমান মজুরি দেয়া হয়েছে।

PLDP- I & II এবং MFTSP

দরিদ্র নারীরা যাতে করে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনসহ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে গ্রহণ করে সেজন্য পিকেএসএফ Participatory Livestock Development Project (PLDP) I & II এবং Micro Finance and Technical Support Project (MFTSP) নামক দুইটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরনের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি মহিলা উপকারভোগীদেরকে এ বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ, কারিগরি সহায়তা ও প্রণোদনা দেয়া হয়।

সমৃদ্ধি (ENRICH)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০১০ সাল থেকে সমৃদ্ধি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 'সমৃদ্ধি' কার্যক্রমের মূল ফোকাস হচ্ছে পরিবারভিত্তিক উন্নয়ন। পরিবারের হাতে থাকা সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সম্পদভিত্তি বৃদ্ধি করা সমৃদ্ধি কার্যক্রমের একটি মৌলিক বিষয়। সমৃদ্ধি কার্যক্রমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বল্প সুদে ঋণ, সঞ্চয়, পরিবেশ রক্ষা, পরিবারসমূহের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষদেরকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই পরিবারভিত্তিক উন্নয়নে পরিবারের পক্ষে একজন মহিলা হবেন মূল প্রতিনিধি। নিম্নে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে নারীর অংশগ্রহণ তুলে ধরা হলো:

- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত জরিপের তথ্যানুযায়ী ২১টি ইউনিয়নে মোট ১,১৭,৬১০টি খানার মধ্যে সমৃদ্ধি কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য উপযোগী খানা সংখ্যা ৮৫,৫২৩টি (শতকরা ৭৩ ভাগ)। এ পর্যন্ত ২১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৫০,৪৮১টি খানাকে সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে ২৪,৫৮১ জন মহিলা সদস্য সহযোগী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ২১টি সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ে 'সমৃদ্ধি'র বিভিন্ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য পৃথক 'সমৃদ্ধি ইউনিট' রয়েছে। উক্ত ইউনিটসমূহে পুরুষ কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি বিভিন্ন পদে নারীরাও কর্মরত রয়েছেন। নারী কর্মকর্তাদের মধ্যে বর্তমানে সংস্থাসমূহে ১ জন সমন্বয়কারী, ৮ জন স্বাস্থ্য সহকারী, ৪ জন সমাজ উন্নয়ন কর্মী এবং ১০ জন এমআইএস অফিসার সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে সকল পরিবারের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ কার্যক্রমে স্বাস্থ্যসেবী পদে ২৩৭ জন নারী কর্মরত রয়েছেন এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হলো পিকেএসএফ কর্তৃক অর্থায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত উপকারভোগীদের বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ (নারী, শিশু ও বয়স্কসহ) জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ অবস্থার টেকসই উন্নয়ন সাধন যেখানে বিশেষভাবে মহিলাদের অপুষ্টির হার হ্রাস করা, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রসব সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার উপরে জোর দেয়া হচ্ছে।
- গ্রামীণ দরিদ্র শিশুদের ঝরে পড়া রোধে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ৫১৯টি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষিকা পদে ৫১৯ জন নারী কর্মরত রয়েছেন।
- সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাভুক্ত শতভাগ পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব বন্ধু চুলার ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে বন্ধু চুলা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শিশু মৃত্যু ও মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর প্রধানতম কারণ হচ্ছে শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ। একজন গৃহিণী দিনের বেশিরভাগ সময়ই রান্নাঘরে থাকেন এবং তাঁর সাথে সাথে তাঁর শিশুটিও রান্নাঘরে থাকে। গ্রামাঞ্চলে যে প্রচলিত চুলা ব্যবহার করা হয় সেই চুলার ধোঁয়া থেকে এই শ্বাসযন্ত্রের প্রদাহ হয়। শিশু মৃত্যু ও মাতৃকালীন মৃত্যু প্রতিরোধ, মহিলাদের শ্বাসকষ্ট রোগ প্রতিরোধ ও এ সংক্রান্ত চিকিৎসাজনিত ব্যয় কমানো এবং রান্নার কাজে সময় কম ব্যয় করে নারীদের উৎপাদনমুখী কাজে লাগানোর জন্য উন্নত চুলা ব্যবহার করার জন্য সমৃদ্ধি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত সকল পরিবারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট আড়াই হাজার বন্ধু চুলা সমৃদ্ধির আওতায় দেয়া হয়েছে।

দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনের সময়ে বিশেষ বিশেষ অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য পিকেএসএফ সম্প্রতি তিনটি তহবিল গঠন করেছে: **বিশেষ তহবিল, কর্মসূচি সহায়ক তহবিল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল**। অতিসম্প্রতি পিকেএসএফ বিশেষ তহবিলের আওতায় 'অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম'ভুক্ত উপকারভোগী সদস্যদের ১৮৬ জন মেধাবী ছেলে-মেয়েদের বৃত্তি প্রদান করে, যার মধ্যে ৬৮ জন ছিল মেয়ে।

নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ

পিকেএসএফ বর্তমানে মোট ৬৫,৭৩,০৩৮ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থিক পরিষেবা দিচ্ছে, যারমধ্যে ৫৮,৯৯,২৪২ জন অর্থাৎ ৮৯.৭৪% উপকারভোগী নারী। পিকেএসএফ-এর বর্তমানে মোট ২৬৯টি সহযোগী সংস্থা রয়েছে যারমধ্যে ২৮টি সহযোগী সংস্থার প্রধান নির্বাহী নারী।

সময়ের সাথে সাথে পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। পিকেএসএফ কৃষি ঋণ, গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ, অতিদরিদ্রদের জন্য বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ, ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ প্রদান করছে। বিশেষ বিশেষ অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করেছে। পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের নতুন সংযোজন হচ্ছে সমৃদ্ধি যেখানে টেকসইভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ-এর সকল কর্মসূচিতে অর্থায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি সহায়তাও প্রদান করা হচ্ছে। যেহেতু পিকেএসএফ-এর ৮৯.৭৪% উপকারভোগী নারী, সেহেতু এই উপকারভোগী নারীরা পিকেএসএফ-এর আর্থিক পরিষেবা ও কারিগরি সহায়তায় সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়ার পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা ও সামর্থ্য অর্জন করছে।

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, যে সকল নারীরা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেননি তাঁদের তুলনায় কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী নারীদের পরিবারে তাঁদের জন্য বিশেষ একটি সম্মানজনক অবস্থান তৈরি হয়েছে। তাঁরা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেক শক্তিশালী ভূমিকা রাখছেন, পারিবারিক আয় উপার্জনে পূর্বের চেয়ে অনেক সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন এবং নারী ঋণগ্রহীতারা এখন তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে সচেতন। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী নারীদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র মহিলারা তাঁদের নাজুক সামাজিক ও পারিবারিক দৈন্যদশা থেকে বের হয়ে আসার পথ পেয়েছেন। পারিবারিক আয় এবং ব্যয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের মতামতের মূল্য দেয়া হচ্ছে। নারীদের নিজেদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা বেড়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, নারী ঋণগ্রহীতারা এখন নিজ ঘরের বাইরে অন্যান্য মানুষের সাথে মেশার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। অনেক উপকারভোগী নারী সদস্যরা তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন।

পরিশেষ

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদেরকে লক্ষ্যভুক্ত করে পিকেএসএফ বিগত একুশ বছর ধরে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছে। পিকেএসএফ-এর বৈচিত্র্যপূর্ণ আর্থিক পরিষেবা এবং কারিগরি সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ফলে এ সকল দরিদ্র নারীদের সামাজিক এবং পারিবারিক অবস্থানের ধনাত্মক পরিবর্তন ঘটেছে। ১৯৯০ সালে ছোট একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে পিকেএসএফ বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি অঙ্গীকার পূরণ, সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

এ যাবৎকালের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে পিকেএসএফ দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে নারীদেরকে লক্ষ্যভুক্ত করে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, অর্থ প্রবাহ, প্রাকৃতিক পরিবেশ, সামাজিক পরিবেশ, মূল্যবোধ, সুযোগ সৃষ্টি ও গ্রহণে স্বাধীনতাসহ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন অনুষঙ্গ অন্তর্ভুক্ত করে কাজ করে যাবে যাতে করে নারীরা সকল প্রকার বঞ্চনা ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেদেরকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

নির্বাচিত নারী উদ্যোক্তাদের সফল কাহিনী

চুড়ি তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করে দারিদ্র্যকে জয় করেছেন ডলি

সাজেদা ফাউন্ডেশন

ঢাকা জেলার দোহার থানার মেয়ে ডলি দারিদ্র্যমুক্ত জীবন-যাপনের স্বপ্ন দেখতেন। স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তিনি চুড়ি তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করে ২৫ জন দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন। ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা ডলি চুড়ি তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠা করে নিজের ও অন্যদের দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান রাখছেন।

ঢাকা জেলার দোহার থানার মেয়ে ডলি। অনেক ছোটবেলায় বাবা-মা'র হাত ধরে জীবন আর জীবিকার তাগিদে চলে আসেন ঢাকার কেরাণীগঞ্জের খেজুরবাগ এলাকায়। নিতান্তই দরিদ্র পরিবারের সন্তান ডলি। লেখাপড়ার সুযোগ তেমন হয়নি। খুব অল্প বয়সেই বাবা-মা ডলির বিয়ে দিয়ে দেন। স্বামীর ঘরেও সীমাহীন অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে থাকেন। ডলির স্বামী সেন্টু মিয়া ঢাকার চকবাজারে এক চুড়ির কারখানায় নামমাত্র মজুরিতে কাজ করতেন। একদিন মালিকের চরম দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষোভে-কষ্টে কাজ ছেড়ে দেন ডলির স্বামী। সংসার যেন আর চলতে চায় না।

ডলি তাঁর স্বামীর মুখে শুনতেন কিভাবে কাঁচের চুড়ি তৈরি হয়। সেসব গল্প শুনতে শুনতে কতদিন ভেবেছেন যদি নিজের এমন একটা কারখানা থাকত তাহলে মন্দ হতনা। কিন্তু দু'বেলা ভাতই যেখানে জোটেনা সেখানে এমনটা ভাবা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না। তবুও স্বপ্নটাকে সত্যি করার যুদ্ধে নেমে পড়েন স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই। যেহেতু ডলির স্বামী চুড়ি তৈরির কাজটা আগেই শিখেছেন, তাই কাজ শেখার ভাবনা তাঁকে করতে হলনা। এখন শুধু টাকা দরকার, কিন্তু কোথায় পাবেন টাকা? এত টাকা কে দেবে? এসব ভাবতে ভাবতে হতাশ হয়ে পড়েন ডলি।

ডলি তাঁর এক প্রতিবেশীর নিকট থেকে "সাজেদা ফাউন্ডেশন"-এর কথা জানতে পারেন। সাজেদা ফাউন্ডেশন সমাজের সহায়-সম্বলহীন এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের সংগঠিত করে ঋণ প্রদান করে। একথা জানার পর ডলি সাজেদা ফাউন্ডেশনের কেরানীগঞ্জস্থ চুনকুটিয়া শাখার ৫৩নং কেন্দ্রে ভর্তি হন। প্রথম দফায় তিনি সাজেদা ফাউন্ডেশন থেকে ৫,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং সেই টাকা দিয়ে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে চকবাজার থেকে কাঁচের চুড়ি কিনে এনে মহল্লায়-মহল্লায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতে লাগলেন। প্রতিদিন ১০০-১৫০/- টাকা লাভ হত। সংসার চালানোর পাশাপাশি নিয়মিত কিস্তির টাকাও পরিশোধ করতে লাগলেন ডলি। কিন্তু নিজের কারখানা তৈরির কথা তিনি ভোলেননি। আস্তে আস্তে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। আরো কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন। তাঁর ব্যবসার পরিধি বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে নিজেও কিছু পুঁজি সঞ্চয় করতে থাকেন। একদিন স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করে চুঁড়ি তৈরির কিছু উপকরণ কিনেন। এভাবে একটু একটু করে তাঁর কারখানার স্বপ্ন বাস্তব হতে থাকে। অতিরিক্ত একটি ঘরও ভাড়া নেন ডলি এবং স্বামী-স্ত্রী মিলে চুড়ি তৈরি শুরু করেন। শুধু তৈরিই করেননা ডলি, নিজে বিভিন্ন মহল্লায় স্কুল-কলেজের সামনে মেলায়, ঘুরে-ঘুরে নিজের তৈরি চুড়ি বিক্রি করেন এবং ডলির স্বামী চকবাজারের বিভিন্ন দোকানে পৌঁছে দেন। তাঁদের ব্যবসা ভালই চলতে থাকে। একটা চুড়ি প্রথম থেকে শুরু করে ব্যবহারের উপযোগী করতে অনেক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। সেজন্য তাঁদেরকে

অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে হয়। এখন তাঁদের কারখানায় স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ১৫ জন। এছাড়াও আশেপাশের নারীরা অবসর সময়ে ঘরে বসে ডলির কারখানা থেকে চুড়ি এনে তাতে নকশা করা, জরি লাগানো ও পাথর বসানোর কাজ করেন। এতে তাঁদের সংসারেও সচ্ছলতা এসেছে।

বর্তমানে ডলি সাজেদা ফাউন্ডেশন থেকে ১,৫০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। একটি ঘরের পরিবর্তে চারটি ঘর নিয়ে এখন তাঁর কারখানায় চুড়ি তৈরির কাজ চলে। কর্মচারীদের পাশাপাশি ডলিও কাজ করেন। ডলির কারখানায় কাজ করে অনেকেই এখন স্বাবলম্বী। এলাকায় চুড়ি ব্যবহারেও বেশ চাহিদা রয়েছে। এই চুড়ি তৈরিতে খরচও তুলনামূলকভাবে কম। লেখাপড়ার পাশাপাশি ডলির ছেলেমেয়েরাও এই চুড়ি তৈরির কাজে সহযোগিতা করে। প্রতি সপ্তাহে ডলি কেন্দ্রের সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত থেকে অন্যান্য সদস্যদেরকে তাঁর সংগ্রামী জীবনের গল্প শোনান। কিভাবে তিনি সাজেদা ফাউন্ডেশন-এর আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি নিজের অদম্য প্রচেষ্টায় এত দূর এসেছেন, সেসব কথা শোনান তাঁর প্রতিবেশীদের। প্রথম প্রথম অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তাঁকে প্রতিবেশীরা বিদ্রুপ করত। কিন্তু ডলি সেসব কথা পাত্তা দেননি। তাঁর আজকের সফলতা দেখে অনেকেই এখন উদ্যোগী হয়েছেন এ ধরনের কাজ করতে। রং-বেরঙের চুড়ি তৈরি করেন ডলি। তাঁর তৈরি চুড়ি বাজারজাত করতে সমস্যা হয়না। ডলির বাসায় প্রতিদিন দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতারা আসেন। এছাড়াও ডলির স্বামী নিজে দোকানে দোকানে গিয়ে চুড়ি দিয়ে আসেন। আশেপাশের সকল মানুষই এখন ডলিকে চেনেন, জানেন তাঁর সংগ্রামী জীবন আর সফলতার ইতিহাস।

ডলির স্বপ্ন তাঁর কারখানাকে আরও বড় করার, যাতে সেখানে আরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়। তিনি সমাজের অবহেলিত বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান। ডলির সংসারে এখন আর কোন অভাব নেই। তিনি পেরেছেন তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে। তিন মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। মেয়েদের নিয়মিত স্কুলে পাঠাচ্ছেন ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে। তাঁর চোখে-মুখে এখন পরিতৃপ্তির হাসি। যুদ্ধ জয়ের ঝিলিক, দারিদ্র্যের কাছে তিনি হেরে যাননি। সংগ্রাম করে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ছালেহা বেগম হাঁস-মুরগি ও গরুর খামার করে স্বাবলম্বী হয়েছেন

অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট

ছালেহা বেগম পুরুষের উপর নির্ভরশীল থাকতে পছন্দ করেন না। তিনি সবসময় আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করেছেন। নিজের প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ সহযোগিতায় বর্তমানে তিনি হাঁস-মুরগি ও গরুর খামার গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে তিনি একজন স্বাবলম্বী নারী। এলাকায় তিনি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত। সবাই তাঁকে সম্মান করেন।

কুমিল্লা জেলার কোতয়ালী থানার সৈয়দপুর গ্রামে ছালেহা বেগমের বাস। অভাবের সংসারে পরিবারের সদস্যদের ঠিকমত খেতে দিতে পারতেন না। শাশুড়ি আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য লেগেই থাকতো। সংসারের যাতনায় ও অভাবের তাড়নায় একবার স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। স্বামী অন্যের জমিতে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে ও অন্যের জমি বর্গা নিয়ে কৃষিকাজ করতেন। সংসারের অভাব ঘোচাতে স্বামীকে বিদেশে পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত দালালের খপ্পরে পড়ে তাঁকে অনেক অর্থ-সম্পদ হারাতে হয়েছিল। এর কিছুদিন পর ছালেহা বেগম প্রতিবেশীর মাধ্যমে অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট সংস্থার ঋণ কার্যক্রমের কথা জানতে পারেন এবং অন্তর-এর উন্নয়ন কর্মীর মাধ্যমে সংস্থার গ্রাম সমিতির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন। গ্রাম সমিতির সদস্য হওয়ার পর ছালেহা বেগম প্রথম দফায় গরু ক্রয় খাতে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ৮,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এরপর কয়েক দফায় ঋণ গ্রহণ করে তা যথাযথ ব্যবহার করেন। ছালেহা পঞ্চম দফায় ডেইরি ফার্ম করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ হিসেবে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন।

বর্তমানে ছালেহা বেগম ৩টি গাভী নিয়ে একটি দুগ্ধ খামার; ৫০টি হাঁস এবং ২৮টি মুরগি নিয়ে একটি খামার গড়ে তুলেছেন এবং ভাল আয় করছেন। নিজের চাহিদা মিটিয়ে প্রত্যেকদিন প্রায় ২০ লিটার দুধ এবং গড়ে ৫০টি ডিম বাজারে বিক্রি করছেন। ছালেহা বেগম ২০ শতাংশ জমিতে ১টি টিনের ঘর, ১টি রান্নাঘর ও ১টি গোয়ালঘর তৈরি করেছেন এবং কৃষি কাজের জন্য ৬০ শতাংশ কৃষি জমি ক্রয় করেছেন। ছালেহা বেগম নিজের কর্মদক্ষতা দিয়ে আজ একজন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। স্বামী-সন্তান নিয়ে ছালেহা বেগমের আজ সুখের সংসার। প্রথম সন্তান মেয়ে, এস.এস.সি পাশ করার পর বিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তান ছেলে লেখাপড়া করছে। ছালেহা বেগমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তাঁর ছেলেদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। ছালেহা বেগম সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখতে চান, তিনি পুরুষের উপর নির্ভরশীল না থেকে আজ একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। ছালেহা বেগম নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেক নারী নিজের কর্মদক্ষতার মাধ্যমে সমাজে তাঁদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবেন।

আলেকজানের অভাব জয়ের কাহিনী

নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)

আলেকজান সফল এক সংগ্রামী নারী। আলেকজানের স্বপ্ন ছিল ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমাজে ভালভাবে বেঁচে থাকার। দরিদ্র পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে অনেক কিছু করার চিন্তা থাকলেও অর্থের অভাবে কিছুই করতে পারছিলেন না। সামান্য কিছু জমি ছিল, তাতে ৫০টি চারাগাছ দিয়ে নার্সারি শুরু করার মাধ্যমে তাঁর নতুন স্বপ্নের সূচনা হয়।

নিজের কর্মদক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে যে নারী তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করেছেন তিনি আলেকজান বেগম। যিনি শরীয়তপুর জেলার, জাজিরা উপজেলার বাইকসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মকে যিনি ধ্যানে এবং জ্ঞানে লালন করেছেন। নার্সারি দিয়ে শুরু হয় তাঁর কর্মের সাধনা। বর্তমানে তিনি ৮ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। আলেকজান এক সফল সংগ্রামী নারী। আলেকজানের স্বপ্ন ছিল ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমাজে ভালভাবে বেঁচে থাকার। দরিদ্র পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে অনেক কিছু করার চিন্তা থাকলেও অর্থের অভাবে কিছুই করতে পারছিলেন না। সামান্য কিছু জমি ছিল, তাতে তিনি ৫০টি চারাগাছ দিয়ে নার্সারি শুরু করেন এবং স্বামী ও ছেলেরা ভাড়ায় ভ্যান চালাতে থাকে। প্রতিদিন যে আয় হতো তা দিয়ে কোনরকমে সংসার চলতো। টাকার অভাবে নার্সারি বড় করতে পারছিলেন না। একদিন আলেকজান পাশের বাড়ির শ্রীমতির কাছে নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি (নুসা)'র কথা জানতে পারেন। তিনি সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, নুসা সমাজের অসহায় মানুষদের নিয়ে সমিতি গঠন করে ঋণ প্রদান করে থাকে। এই কথা শুনে আলেকজান নুসার মাঠ কর্মীর সাথে আলোচনা করে সংগ্রাম সমিতির সদস্য হন। প্রথম দফায় ৮০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তাঁর কুঁড়েঘরের এক কোণে নার্সারির কাজ একটু একটু করে বাড়াতে থাকেন। প্রতি বছর যা লাভ হয় তা দিয়ে তিনি নুসার কিস্তি চালিয়ে ব্যবসা আরো বড় করতে থাকেন। বর্তমানে তিনি তাঁর ব্যবসা বাড়িয়ে নার্সারি অনেক বড় করেছেন। তাঁর পাশাপাশি ২টা কাজি পেয়ারার বাগান ও ২টা গাভী পালন করছেন। এছাড়া ভাড়া দেয়ার জন্য একটি টিনের ঘর তৈরি করেছেন, যা থেকে প্রতি মাসে ৪/৫ হাজার টাকা ভাড়া পান। বর্তমানে আলেকজান ৫ম দফায় ৫০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। সংস্থার কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ এবং সংস্থার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে আলেকজান বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতা হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাতে পরিণত হয়েছেন। বর্তমানে আলেকজান বেগম তাঁর নার্সারি, পেয়ারা বাগান এবং গাভী পালন হতে বছরে ১,২০,০০০/- টাকা আয় করে থাকেন। তাঁর স্বামীকে আগে কেউ কোন ভাল কাজে ডাকতো না, এখন এলাকার কোন সালিশ হলে তাঁকে ডাকে। সমাজে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করাতে সক্ষম হয়েছেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশ সুখে দিন যাপন করছেন এবং তাঁর ব্যবসায় দিন দিন আরো উন্নতি হচ্ছে। বর্তমানে তিনি একজন সফল নারী।

সংগ্রামী জান্নাতুল ফেরদৌস-এর সফলতার গল্প
প্রত্যাশী

পরিশ্রমী মানুষ কখনও পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। শত অভাবও তাঁকে হার মানাতে পারে না। জান্নাতুল পরিশ্রমী ও কর্মঠ এক নারী। নিজের শ্রম আর মেধাকে কাজে লাগিয়ে তিনি অভাব জয় করেছেন।

কর্ণফুলী নদীর তীরে চান্দগাঁও জনপদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস। বিয়ে হয় ২০০১ সালে। স্বামীর ঘর সংসার করেন মাত্র তিন বছর। যৌতুকের লোভে তিন বছর পর ২০০৪ সালে জান্নাতের স্বামী ইকবাল হোসেন আরেকটি বিয়ে করেন। জান্নাতুল স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। অত্যাচারী স্বামী থেকে রেহাই পেয়ে জান্নাতুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। স্বামী থেকে পৃথক হয়ে তিনি স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেন। প্রত্যাশীর কিছু কর্মীর সাথে তাঁর পরিচয় হয়। ২০০৬ সালের মে মাসে প্রত্যাশী সংস্থা থেকে ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে চালু করেন একটি বিউটি পার্লার। তিনি স্বল্প সময়ে বিউটি পার্লারের কাজ শিখে নেন। জান্নাতের বিউটি পার্লারের চাহিদা দ্রুত বাড়তে থাকে। আয় রোজগারও হয় ভাল। চাহিদা মাফিক পার্লারের কাজের জন্য নিয়োগ দেয়া হয় দু'জন বিউটিশিয়ান। এভাবে বিউটি পার্লারের কাজের সাফল্যে তাঁর বাড়ে আত্মবিশ্বাস, বাড়ে মনোবল। পার্লারের কাজের পাশাপাশি বুটিকের কাজ শুরু করেন। জান্নাতের ব্যবসার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি আরও উৎসাহিত হন, খুঁজে পান জীবন সংগ্রামে বেঁচে থাকার পথ।

বিউটি পার্লারের পাশাপাশি আরেকটি দোকানঘর নিয়ে পুরোদমে শুরু করেন বুটিকের কাজ। ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার করার লক্ষ্যে ২০১১ সালে তিনি ৫ম দফায় ৮০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে "গিফ্‌ট গ্যালারী" এর ব্যবসা সম্প্রসারিত করেন। গিফ্‌ট গ্যালারী ব্যবসায় সফলতা আসায় উন্মোচিত হয় তাঁর জীবনের নতুন দিগন্ত। তিনি তাঁর দোকানের পাশে ব্যায়ামের জন্য চালু করেন একটি ফিটনেস জোন। এর ফলে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পাঁচজন মহিলার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ৭ জন নারী ও ১ জন পুরুষ কর্মরত আছেন। জান্নাত এখন এক মেয়ে নিয়ে তাঁর মায়ের সাথে সুন্দর সুখী জীবনযাপন করছেন। জান্নাতের উদ্যোগটি স্বাস্থ্যবান্ধব ও অসহায় নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির আদর্শ উদ্যোগ।

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে মুরশিদা বেগম আজ সফল

জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট (জেআরডিএম)

অভাবের সংসারে স্বামীর উপর বোঝা হয়ে থাকেননি মুরশিদা বেগম। নিজের প্রচেষ্টায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা সঠিকভাবে বিনিয়োগ করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ তিনি একজন সফল ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা।

জয়পুরহাট সদর উপজেলার ধুলাতর গ্রামের মোঃ আজাহার আলীর সাথে ১৯৭৭ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন মোছাঃ মুরশিদা বেগম। তিনি মাত্র ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করার সুযোগ পেয়েছেন। স্বামী কাঁচামালের (শাক-সবজি) স্বল্প পুঁজির ব্যবসায় যা আয় করেন তা দিয়ে দুই ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে কোনরকমে দিন চলে। কখনও অর্ধাহারে কখনও অনাহারে থাকতে হয়। অভাবের তাড়নায় ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানোর বদলে দুই ছেলেকে অন্যের বাড়িতে কাজে লাগাতে বাধ্য হন মুরশিদা বেগম। তিনি কি করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। এক পর্যায়ে ২০০৩ সালে জেআরডিএম-এর উন্নয়ন কর্মীর পরামর্শক্রমে মুরশিদা বেগম জয়পুরহাট সদর শাখার ধুলাতর মহিলা সমিতিতে ভর্তি হন। প্রথমে ৫,০০০/-টাকা পরে পর্যায়ক্রমে ৭,০০০/- থেকে ২০,০০০/-টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করেন। গৃহীত ঋণ স্বামীর ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। মুরশিদা বেগম চিন্তা করেন তাঁর স্বামীর একার আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে সংসারের অভাব দূর হবে না, তাই তাঁকে কিছু একটা করতে হবে।

২০০৮ সালে গরু মোটাতাজাকরণ কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ২টি গরু নিয়ে একটি খামার চালু করেন। খামার থেকে যে লাভ আসে তা দিয়ে আরও ১টি গরু ক্রয় করেন। জেআরডিএম হতে ৬ষ্ঠ দফায় ২,০৭,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন মুরশিদা বেগম। যা দিয়ে গরুর শেড নির্মাণসহ ৪টি উন্নত জাতের গাভী ক্রয় করেন। এক বছর পর ৪টি বাছুর গরু বৃদ্ধি পায়। গরু এবং দুধ বিক্রি করে এক বছরে লাভ আসে প্রায় ১,৩৪,০০০/-টাকা, যা দিয়ে ১ বিঘা জমি ক্রয় করেন। পরবর্তীতে ২০১০ সালে ৪টি গরু এবং দুধ বিক্রি করে সর্বমোট লাভ আসে ১,৩০,০০০/-টাকা, যা দিয়ে ২ ছেলেকে ২টি ইজি পাওয়ার (অটোরিক্সা) কিনে দেন এবং ১০ শতক জমি ক্রয় করেন। এখন ইজি পাওয়ার থেকে মাসে লাভ আসে ১৫,০০০/- টাকা। তৃতীয় বছর ২০১১ সালে ৩টি বাছুর গরু বিক্রি করে লাভ আসে ৫২,০০০/- টাকা এবং দুধ বিক্রি করে লাভ আসে ৫৫,০০০/-টাকা। সর্বমোট ১,০৭,০০০/-টাকা দিয়ে শেডের সংস্কার ও সম্প্রসারণ কাজ করার পর উন্নত জাতের ১টি গাভী ক্রয় করেন। এরপর থেকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি মুরশিদা বেগমকে। সংসারে আর কোন অভাব নেই। স্বামীসহ মুরশিদা বেগম গরুর খামার তদারকির কাজে ব্যস্ত থাকেন। খামারে কাজের পাশাপাশি অবসর সময়ে দুই ছেলে ইজি পাওয়ার চালায়। এখন তাঁর সংসারে মাসিক আয় ২৫,০০০/-টাকা। বর্তমানে তাঁর খামারে ৫টি গাভী ও ৩টি বাছুর গরু রয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য ৩,৫০,০০০/-টাকা। এছাড়াও তিনি পরিবেশ বিষয়ে বেশ সচেতন। তাঁর খামার থেকে পাওয়া গোবর বায়োগ্যাস হিসেবে ব্যবহার করছে এবং ব্যবহারকৃত গোবর জৈব সার হিসেবে নিজের জমিতে ব্যবহার করছে। বর্তমানে তিনি একজন সফল নারী উদ্যোক্তা।

মিনি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্য জয় করলেন সখিনা

পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী

অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৯ বছরের পথ পরিক্রমায় হাজারো প্রতিকূলতার মাঝে সখিনা বেগম খুঁজে পেয়েছেন তাঁর ঠিকানা। এ যেন এক সাহসী নারীর গল্পগাঁথা। জয়পুরহাটের গোপীনাথপুর গ্রামে জন্ম হয় সখিনা বেগমের। কঠোর পরিশ্রম আর অদম্য আগ্রহ তাঁর জীবনে আনে সফলতা। মাত্র ২,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তিনি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং প্রতিষ্ঠা করেন একটি মিনি গার্মেন্টস্, যেখানে ৪০ জন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করেন। বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় ৫৫,০০০/- টাকা।

প্রায় ১৯ বছর আগের কথা, জয়পুরহাটের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল, যেখানে দিনের আলো নিভে গেলে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালানোর উপায় ছিলনা, সেই গ্রামের গোপিনাথপুর স্কুল থেকে ১৯৮৯ সালে এসএসসি পাশ করেন সখিনা বেগম। এসএসসি পাশের পর পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে সখিনার পড়াশুনা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। ১৯৯২ সালে ঢাকা জেলার আশুলিয়া থানার অন্তর্গত গোমাইল গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত যুবক ফজলুর রহমানের সাথে সখিনা বেগমের বিয়ে হয়। ফজলুর রহমান ছিলেন ভাই-বোনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। পারিবারিক সমস্যার কারণে বিয়ের পরপরই তাঁকে সংসার থেকে পৃথক করে দেয়া হয়। সখিনাকে নিয়ে শুরু হয় তাঁর নতুন সংগ্রামী জীবন।

ফজলুর রহমানের পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া সম্পদের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র ছোট্ট একটি মাটির ঘর। বেকার ফজলুর নতুন সংসার কিভাবে পরিচালনা করবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাও আবার নিয়মিত কাজ জুটতো না। অনেক সময় তিনবেলা পেট পুরে খাবার খেতে পারতেন না। এমতাবস্থায় তাঁর স্ত্রী সখিনা ভাবেন, স্বামীর পাশাপাশি তাঁরও কিছু একটা করা প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন মূলধন। কোথায় পাবেন এই আর্থিক সহায়তা?

একদিন বিকালে পাশের বাড়িতে পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী (পিএমকে)-র জিরাব-১ শাখার এক উন্নয়ন কর্মীর সাথে তাঁর দেখা হয়। বিভিন্ন কথাবার্তার এক পর্যায়ে তিনি জানতে পারেন, পিএমকে পরিচালিত সমিতিতে ভর্তি হলে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা পাওয়া যায়। তারপর তিনি বাড়িতে এসে স্বামীর সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করে সমিতিতে ভর্তি হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৯৩ সালে তিনি গুমাইল-২নং সমিতিতে ভর্তি হন। প্রতি সপ্তাহে ২ টাকা হারে সঞ্চয় জমা করতে থাকেন। এভাবে ৩ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর নিয়মিত সঞ্চয় প্রদান ও সন্তোষজনক আচার-আচরণের কারণে তাঁকে পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী জিরাব-১ শাখা অফিস থেকে প্রথম দফায় ২,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। বুদ্ধিমতি সখিনা ২,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ৫০টি মুরগির বাচ্চা কিনে ছোট্ট একটি ঘরে মাতৃস্নেহে লালন-পালন করতে থাকেন। কিছুদিন পর মুরগি ডিম দিতে শুরু করে। এই দৃশ্য দেখে তাঁর মুখে হাসি ফোটে চোখে আসে জল। সেই ডিম বিক্রি করে আরও ২০টি নতুন বাচ্চা ক্রয় করেন সখিনা।

এভাবে মুরগির ডিম বিক্রি থেকে তাঁর আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি মুরগি পালনের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। তাঁর উন্নতি দেখে সংস্থা তাঁকে পরবর্তীতে ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে প্রতিবছর ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে মুরগির সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে থাকেন। এমনিভাবে একপর্যায়ে তাঁর পোল্ট্রি ফার্মে মুরগির সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ৭০০০। বড় একটি টিনশেডে খামারটি পরিচালিত হতে থাকে এবং সেখানে ৮ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়। কর্মচারীরা উপার্জিত অর্থ দ্বারা তাঁদের পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করেন। কর্মসংস্থানের এই কিঞ্চিত অংশীদার সখিনাকে এনে দেয় এক অনাবিল শান্তি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নতুন দিগন্ত। সখিনা খুবই বুদ্ধিমতী এবং উদ্যোগী। তাই তিনি মুরগির ব্যবসার পাশাপাশি ১টি গাভীও পালন করতে থাকেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে কঠোর পরিশ্রম করে সেই গাভী থেকে পর্যায়ক্রমে একটি ডেইরি ফার্মে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু ভাগ্যের এক নির্মম পরিহাস! বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বার্ড ফ্লু নামক এক ভয়াবহ ভাইরাসের কারণে তাঁদের দীর্ঘদিনের কষ্টার্জিত পোল্ট্রি ফার্মের ব্যবসায় ধ্বস নেমে আসে। অদম্য সাহসী এবং পরিশ্রমী সখিনা ভেঙ্গে না পড়ে স্বামীর সাথে পরামর্শক্রমে বিকল্প আয়ের চিন্তা করেন। তাঁর এলাকায় পোশাক শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা দেখে নতুন উদ্যমে ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে একটি পোশাক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন।

কোন ধরনের পোশাকের চাহিদা বেশি সে ব্যাপারে তিনি অবগত হন। এরপর তিনি স্থানীয় যুবপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে টেইলারিং ও এমব্রয়ডারী বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী থেকে ১২তম দফায় ২ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এই টাকা দিয়ে তিনি ৭টি মেশিন কিনে একটি মিনি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে গেঞ্জি, মহিলাদের বিভিন্ন ডিজাইনের ফেব্রিক্স কিনে এনে কাটিং, সুইং ও ফিনিশিং করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করতে শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁর উৎপাদিত গার্মেন্টস সামগ্রী বিদেশেও রপ্তানী করা হয়। এভাবে তিনি পর্যায়ক্রমে প্রতিবছর ঋণের সিলিং বাড়িয়ে নিয়ে ব্যবসা বড় করতে থাকেন। আস্তে আস্তে তাঁর ব্যবসার পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে তাঁর গার্মেন্টসে মেশিনের সংখ্যা ২০টি। সেখানে মাসিক বেতনে ৪০ জন শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন। উক্ত ব্যবসার মুনাফা এবং সংস্থা থেকে সর্বশেষ দফায় ১০ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ির পাশে ১২ শতাংশের একটি জমি ক্রয় করেন।

সখিনার স্বামীর পৈত্রিকসূত্রে পাওয়া জমি ও তাঁদের ক্রয়কৃত জমির মধ্যে একটিতে ২০টি রুম করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য এবং অপরটিতে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির জন্য ভাড়া দেন। সব মিলিয়ে বর্তমানে তাঁর মাসিক আয় ৫৫,০০০/- টাকা। সমিতিতে ভর্তি হওয়ার সময় সখিনার তেমন কোন সম্পদ ছিল না। তাঁর স্বামীর একটি পুরাতন বাইসাইকেল আর বসবাসের জন্য ছিল ছোট্ট একটি মাটির ঘর। বর্তমানে তাঁর স্বামী ১২৫ সিসির একটি মোটর সাইকেল ব্যবহার করেন এবং মালামাল সরবরাহ করার জন্য একটি মাইক্রোবাস ব্যবহার করেন, বসবাসের জন্য একটি দালান বাড়ি তৈরি করেছেন। ঘরে ব্যবহারের জন্য রঙিন টেলিভিশন, ফ্রিজ এবং ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা করার জন্য খেলনা সামগ্রী ক্রয় করেছেন। তাঁদের ৩ মেয়ে ও ১ ছেলে। বড় মেয়ে এসএসসি পাশ করার পর বিয়ে দেন। অন্য ছেলেমেয়েরা বর্তমানে পড়াশুনা করছে। তাঁর ইচ্ছা, ছেলেমেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে আজ সখিনা এ পর্যায়ে এসেছেন। বর্তমানে তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে সুখে আছেন ।

কাজলের রিং স্লাব ও ঘরের খুঁটি তৈরির কারখানা

সোস্যাল আপলিফ্টমেন্ট সোসাইটি (সাস)

পরিশ্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্যকে দূর করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার কর্মঠ নারী কাজল। তিনি কাপড় সেলাই করে অর্থ সঞ্চয় করেছেন। সঞ্চিত অর্থ এবং স্বামীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে স্যানেটারি কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। আজ তিনি একজন সফল ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা।

কাজল দরিদ্র পরিবারের একজন গৃহবধূ। তাঁর স্বামী মোঃ মফিজুল ইসলাম। তিনি একজন দিনমজুর একটি স্যানেটারি কারখানায় কর্মরত। দৈনিক ১৫০/-টাকা মজুরিতে কাজ করেন, মাস শেষে ৪,৫০০/-টাকা রোজগার হতো। এত অল্প আয়ে ঘর ভাড়া দিয়ে ৩টি সন্তান নিয়ে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর ছিলো। আর্থিকভাবে দারুন কষ্টের মধ্যে চলতে থাকেন। আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসলে তাঁদের আর্থিক টানাটানি দেখে তাড়াতাড়ি চলে যেতো। সামাজিক মর্যাদা বলতে যা বুঝায় তার কিছুই ছিল না তাঁদের। এলাকার কেউ তাঁদেরকে তেমন চিনতো না। কোন সমস্যা নিয়ে গেলে কেউ আমল দিতো না। নিজেকে অসহায় মনে করতেন কাজল। সংসারে আর্থিক পরিবর্তন কিভাবে আনা যায়, সবসময় তা চিন্তা করতেন। একদিন স্বামীকে বললেন, একটি সেলাই মেশিন কিনে নিতে, স্বামী বললেন তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কাজল তথাপিও হাল ছাড়লেন না। পাশের বাসার একজন আপার সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারেন, 'সাস' সংস্থা থেকে ঋণ নেওয়া যায় এবং তা কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়। কাজলের মহল্লায় 'সাস' সংস্থার একটি সমিতি ছিলো। সেই সমিতির উন্নয়ন কর্মীর সাথে আলোচনা করে সমিতির নিয়ম কানুন সম্বন্ধে বিস্তারিত জেনে তিনি সমিতিতে ভর্তি হন। প্রতি সপ্তাহে সমিতিতে গিয়ে সঞ্চয় দেন। সমিতির সংগঠকদের কাছ থেকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের কথা শুনে তাঁর মধ্যে আরো উৎসাহ সৃষ্টি হয়। প্রত্যেকেই একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য ঋণ নিয়েছেন এবং প্রকল্প থেকে আয় করে নিয়মিত কিস্তি চালিয়ে যাচ্ছেন। 'সাস' সংস্থা থেকে ২,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে এবং নিজের জমানো ১,৫০০/-টাকা একত্রিত করে মোট ৩,৫০০/-টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। কাজল বিয়ের আগে দর্জি কাজ শিখেছিলেন। সেলাই মেশিন কিনে প্রতিবেশীদের চাহিদা অনুসারে পোশাক তৈরি করতে লাগলেন। এভাবে এলাকায় অল্প সময়ের মধ্যে পরিচিতি অর্জন করেন এবং অনেকের কাছ থেকে কাজ পেতে থাকেন। সেলাই কাজ থেকে প্রতি মাসে গড়ে ৪,০০০/- থেকে ৫,০০০/-টাকা আয় করেন। এভাবে যখন কাজল নিজ উদ্যোগে রোজগার করতে লাগলেন, তখন তাঁর স্বামীর মনোবল আরো বেড়ে গেলো।

নিজেরা একটা স্যানেটারি কারখানা দেয়ার ব্যাপারে কাজল তাঁর স্বামীর সাথে পরামর্শ করেন। ফলে তাঁর স্বামী চাকুরি বাদ দিয়ে নিজেরা একটি জায়গা ভাড়া নেন। পরবর্তীতে তাঁরা নিজেরাই স্যানেটারির মালামাল যেমন ঘরের খুঁটি এবং ল্যাট্রিনের চাক তৈরি করতে শুরু করলেন। একপর্যায়ে ৫ম বছরে 'সাস' সংস্থা থেকে ১০,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে স্যানেটারি ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তখন তিনি বেকার আত্মীয়-স্বজনদেরকে অল্প বেতনে স্যানেটারি

মালামাল তৈরির কাজে লাগান। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী এবং ২ জন কর্মচারী মিলে বেশকিছু মালামাল তৈরি করেন। উৎপাদিত মালামাল সাভার নামাবাজারের বিভিন্ন টিনের দোকানে বিক্রি করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাঁদের স্যানেটারি কারখানায় উৎপাদিত মালামালের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পাইকারী এবং খুচরা কাজের চাহিদা বাড়তে থাকে। কাজল দেখলেন সেলাই কাজের চেয়ে স্যানেটারি কাজে লাভ বেশি এবং ব্যবসা অনেক বড় করা সম্ভব; তখন তিনি সেলাই কাজ ছেড়ে দিয়ে সার্বক্ষণিক স্যানেটারি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

পরবর্তীতে সংস্থা থেকে ৭ম দফায় ১৫,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি মিক্সার মেশিন ক্রয় করেন। কারখানায় কাজের চাপ আরো বেড়ে যায়। আরো ৩ জন লোক নিয়োগ করেন। কারখানায় উৎপাদিত মালামালের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তাঁরা ঘরের খুঁটি, আরসিসি পাইপ, আরসিসি পিলার, ভেন্টিলেটার, কুয়ার চাক, নইচা উৎপাদন করেন। সাভারের বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করেও মানিকগঞ্জ এবং গাজীপুরে মালামাল সরবরাহ করেন। পর্যায়ক্রমে ব্যবসার উন্নতি হতে থাকে। তাঁরা ব্যবসার আয় থেকে বেশকিছু টাকা ব্যাংকে জমা করেন। বর্তমানে তাঁর পরিবারে ৮ শতক বসতজমি রয়েছে। সেই জমিতে একটি ঘর নির্মাণ করেছেন। যার মধ্যে ৬টি কক্ষ ভাড়া দেওয়া আছে। সেখান থেকেও গড়ে প্রতি মাসে ৬,০০০/-টাকা আয় হয়।

স্যানেটারি ব্যবসায় কাজলের আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে যায়। ব্যবসার পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবসায় আরো বিনিয়োগের জন্য 'সাস' সংস্থা থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ হিসাবে ৭০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ গ্রহণ করে খুঁটি তৈরির একটি মেশিন ক্রয় করেন এবং কারখানায় আরো ৫ জন লোক নিয়োগ দেন। কারখানায় মোট ১০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়। দিনে দিনে ব্যবসা আরো সম্প্রসারিত হতে থাকে। কারখানায় উৎপাদন খরচ কম করার জন্য বিভিন্ন গার্মেন্টস থেকে কম দামে মোটা তার, অব্যবহৃত খুচরা ইট ক্রয় এবং সিলেট থেকে সুরকি আনা হতো। উৎপাদন ব্যবস্থাপনার কাজ প্রধানত কাজল নিজেই দেখেন। মালামাল বাজারজাতকরণের প্রধান দায়িত্ব পালন করেন তাঁর স্বামী মফিজউদ্দিন। তাঁর কারখানার দ্বারা পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন কোন দ্রব্যাদি ব্যবহার করেন না। তিনি কাঁচামাল মিক্সিং ও রোলিং এর কাজে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে থাকেন, যেন কোন প্রকার দুর্ঘটনার শিকার হতে না হয়।

বর্তমানে কাজল ৩,০০,০০০/-টাকা নিয়ে নতুন আরেকটি মিক্সার মেশিন ক্রয় করেছেন, পাশাপাশি কাঁচামাল বাবদ পর্যাপ্ত পরিমাণ পাথর ক্রয় করেছেন। ব্যবসায় কাজল সর্বমোট ১৫,০০,০০০/-টাকা মূলধন বিনিয়োগ করেছেন। তা থেকে মাসিক উৎপাদন খরচ, কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ মোট ২,২৫,০০০/-টাকা খরচ হয়। উৎপাদিত মালামাল বিক্রি করে প্রতি মাসে ৩০,০০০/- থেকে ৪০,০০০/-টাকা লাভ থাকে। তাঁর কারখানায় ৩টি খুঁটি তৈরির মেশিন এবং ২টি মিক্সার মেশিন আছে। বর্তমানে কারখানায় ২০ জন শ্রমিক নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়াও মৌসুমভিত্তিক ১২-১৫ জন শ্রমিক চুক্তিভিত্তিক কাজে নিয়োজিত থাকেন। বর্তমানে কারখানায় উৎপাদিত পণ্য কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম (পুটিয়া, আনোয়ারা, বাঁশখালী), সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, ভোলা অঞ্চলেও সরবরাহ করা হয়। কাজলের অনুপ্রেরণায় এলাকায় আরো ২টি মাঝারি আকারের স্যানেটারি কারখানা এবং ৩টি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র চালু হয়েছে। সেখানেও মজুরিভিত্তিক (নিয়মিত ও চুক্তি) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁকে সকলেই অনুকরণ করেন। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অনেকেই তাঁর পরামর্শ নেন। বর্তমানে কাজল একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। তিনি নিজেকে একজন সুখী মানুষ হিসেবেও মনে করেন। কাজল জানান যে, পরিশ্রম করলে জীবন ও সংসারে অবশ্যই উন্নতি করা যায়। এই পরিশ্রমী মানসিকতাই তাঁর জীবনের উন্নতিতে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

কাজল তাঁর বড় মেয়েকে দশম শ্রেণী এবং ছোট মেয়েকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করিয়ে সচ্ছল ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে বর্তমানে দশম শ্রেণীতে পড়ছে। তিনি ব্যবসাকে আরো আধুনিক করে গড়ে তুলবেন বলে প্রত্যাশা করেন। বর্তমানে কাজল সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন একজন সফল ও প্রতিষ্ঠিত মানুষ। এলাকায় তাঁর সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। সকলেই তাঁকে সম্মান করেন।

আত্মপ্রত্যয়ী খামারি মোসলেমা বেগম

আরডিআরএস বাংলাদেশ

উত্তরাঞ্চলের একজন সফল নারী উদ্যোক্তার নাম মোসলেমা বেগম। পোল্ট্রি খামার করে তিনি নিজের অভাব-অনটন ঘুচিয়ে আরও ২৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন।

লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারগোপালের থান গ্রামের দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেন মোসলেমা বেগম। ১৯৮৪ সালে একই উপজেলার ঘনোশ্যাম গ্রামের আঃ মতিন-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামীর সামান্য কৃষি জমির আয় দিয়ে সংসার পরিচালনা কষ্টসাধ্য ছিলো। এরইমধ্যে তাঁদের পরিবারে আসে দু'টি ছেলে ও একটি মেয়ে সন্তান। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সচ্ছলতা কমতে থাকে। মোসলেমা বেগম চিন্তা করেন কিভাবে সংসারের আর্থিক সংকট কাটিয়ে স্বামীকে সহযোগিতা করা যায়।

মোসলেমা বেগম প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারলেন, 'আরডিআরএস বাংলাদেশ' সমাজের অসহায় দরিদ্র মানুষকে নিয়ে সমিতি গঠন করে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে। তিনি সংস্থার উত্তর ঘনোশ্যাম মহিলা দলের সদস্য হন। একপর্যায়ে প্রথম দফায় ২০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করে হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে আরডিআরএস থেকে আরো ঋণ গ্রহণ করে দেশি গাভী ও হাঁস-মুরগি পালন করেন। হাঁস-মুরগির ডিম ও গাভীর দুধ বিক্রি করে নিয়মিত আয় হতে থাকে। আরডিআরএস থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিদেশী গাভী পালনের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে ২টি ফ্রিজিয়ান জাতের গাভী ক্রয় করেন। কিছুদিন পর গাভী ২টির ২টি বকনা বাছুর হয়। গাভী দু'টির দুধ পাশের বাজারে বিক্রি করে তাঁদের অর্থ সংকট কাটতে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় মোসলেমা সংস্থা হতে ৩০ হাজার টাকা ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ গ্রহণ করেন। এই ঋণের সাথে নিজের জমানো টাকা একত্রিত করে গাভী পালনের পাশাপাশি লেয়ার মুরগির ৩০০ বাচ্চা কিনে মুরগি পালন শুরু করেন। বাড়ির পাশে সামান্য অনাবাদি জায়গায় খড়ের ছাউনি দিয়ে মুরগির ঘর তৈরি করেন। ছয় মাসের মধ্যে মুরগি থেকে ডিম আসতে শুরু করে। ডিম, দুধ, গোবর ও মুরগির বিষ্ঠা বিক্রি করে নিয়মিত আয় হতে থাকে। প্রতি বছরের আয়ের উদ্বৃত্ত টাকা এবং আরডিআরএস বাংলাদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে গাভী ও মুরগির খামার সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে তাঁর খামারে ২০০০ লেয়ার মুরগি ও ১৪টি উন্নত জাতের গাভী রয়েছে। পাশাপাশি তিনি নিজ ভিটা জমিতে আপেলকুল, বাউকুল ও স্ট্রবেরির চাষ শুরু করেন। তাঁর গাভী ও মুরগির খামার দেখাশুনা করার জন্য ৪ জন স্থায়ী ও ৬ জন অস্থায়ী শ্রমিক কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে ৩ জন নারী শ্রমিকও রয়েছেন। তাঁর এই খামারে কাজ করে ১০টি অতিদরিদ্র পরিবার জীবন ধারণ করছেন।

মোসলেমার খামারে স্থায়ী শ্রমিকের মাসিক বেতন ৪০০০/-টাকা এবং অস্থায়ী শ্রমিকের দৈনিক পারিশ্রমিক ১৫০/-টাকা। মোসলেমার স্বামী বিভিন্ন কোম্পানী থেকে গরু ও মুরগির খাদ্য ক্রয় করে খামার পরিচালনায় সহযোগিতা করেন এবং পার্শ্ববর্তী বাজারে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে গাভী ও মুরগির খাবারের দোকান দেন। তিনি এলাকায় একজন সফল খামারি হিসাবে পরিচিত। অনেক ছোট খামারে তিনি পরামর্শ প্রদান ও মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ করেন। মোসলেমা বেগমের গাভীর খামারে উৎপাদিত ৪০-৫০ লিটার দুধ স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ীরা পাইকারী মূল্যে ক্রয় করে ছানা ও মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য তৈরি করেন। মোসলেমা খামারের পাশেই একটি ছোট পুকুর খনন করে মুরগি থেকে প্রাপ্ত বিষ্ঠা ও গোবরের কিছু অংশ মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে মাছ চাষেও সাফল্য পেয়েছেন। কৃষি জমিতে এ সকল বিষ্ঠা ও গোবর জৈব সার হিসেবে ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক সার ব্যবহার ছাড়াই ধান, শাকসবজি, আপেলকুল ও বাউকুল, স্ট্রবেরি চাষ করতে পারছেন। ফলে পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মিটিয়েও বাজারে বিক্রি করে খাদ্য সংকট মোকাবিলায় জাতীয় অর্থনীতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন।

স্বামীর পরিপূর্ণ সহযোগিতায় মোসলেমা বেগম একজন ভাল উদ্যোক্তা হওয়ার পাশাপাশি একজন আদর্শ মা হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে বড় ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োক্যামিষ্ট্রিতে এমএসসি পাশ করেছে। বর্তমানে সে এসকেএফ ঔষধ কোম্পানিতে ঔষধের মাননিয়ন্ত্রক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছে। ছোট ছেলে ও মেয়ে এ বছর এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী। মোসলেমা বেগম একজন সুখী মানুষের নাম। তাঁর উদ্যোগটি একটি আদর্শ নারী ও পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ। এই কাজগুলো বাড়িতে বসেই করা যায় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জনও করা যায়। মোসলেমা এলাকার অন্যান্য নারীদের এই কাজে উৎসাহিত করেন। বর্তমানে মোসলেমা বেগমের খামারে প্রায় ৩০,০০,০০০/-টাকা বিনিয়োগ রয়েছে। এছাড়াও তিনি ৪ রুম বিশিষ্ট একটি পাকা টিনশেড বাড়ি, ২০০০ মুরগি পালনের লেয়ারশেড, গাভী পালনের পাকা ঘর এবং ১০ বিঘা জমির মালিক। মোসলেমা বেগম-এর প্রকল্প থেকে মাসিক গড় লাভ ২৫,০০০/- টাকা। আত্মপ্রত্যয়ী মোসলেমা বেগম হতে পারেন উত্তরাঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অনুকরণীয়।

মৎস্য খামারি মরিয়ম আক্তার (পলি)

প্রোগ্রামস ফর পিপলস ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)

সিরাজগঞ্জ জেলার পারকোলা গ্রামের মরিয়ম আক্তার পলি মৎস্য চাষের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা এনেছেন। বর্তমানে তিনি একজন নারী উদ্যোক্তা। ক্ষুদ্র উদ্যোগ ঋণ গ্রহণ করে সফল ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

মরিয়ম আক্তার পলির বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পারকোলা গ্রামে। বিবাহিত জীবনের শুরু থেকেই তাঁকে নানারকম প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে দিন যাপন করতে হয়েছে। স্বামীর স্বল্প আয় সংসারের চাহিদা পূরণ করতে পারতো না। প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তাঁদের আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি হয়। এমতাবস্থায় পলি নিজেই কিছু করার চিন্তা ভাবনা করেন। তিনি জানতেন বিভিন্ন ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা নারীদের উপার্জনক্ষম করে তুলতে ঋণ প্রদান ছাড়াও বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এ ধরনের কয়েকজন নারী সদস্যের সাথে পরামর্শ করে তিনি ২০০২ সালে প্রোগ্রামস ফর পিপলস ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি) নামক বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে সদস্য হিসাবে ভর্তি হন।

হাঁস-মুরগি পালন ও মাছ চাষে পলির আগ্রহ ছিল। গ্রামের একটি পুকুর লিজ নিয়ে সেখানে মাছ চাষ এবং একইসাথে হাঁস-মুরগি পালন করার পরিকল্পনা করেন তিনি। এই উদ্দেশ্যে প্রথমবার ঋণের জন্য পিপিডিতে আবেদন করেন। পিপিডি তাঁর প্রকল্প যাচাই বাছাই করে ৩,০০০/-টাকা ঋণ প্রদান করেন। প্রথম ঋণ নিয়ে তিনি হাঁস-মুরগির খামার করেন। প্রথম বছরেই খামারটি সফলতা পায়। দ্বিতীয় বছর তিনি একটি ছোট পুকুর লিজ নেয়ার উদ্দেশ্যে ৫,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। মাছ চাষেও তাঁর সফলতা আসে। প্রতিবছর তাঁর খামারের আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সেইসাথে ক্ষুদ্রঋণের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। একসময় পলি ক্ষুদ্রঋণ থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ গ্রহণ করে একজন সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন।

সর্বশেষ দফায় পলি ৫,০০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে পলির বার্ষিক আয় প্রায় ৪,৫০,০০০/- টাকা, যা দিয়ে তিনি সংসারের যাবতীয় চাহিদা পূরণে সক্ষম। স্কুলে অধ্যয়নরত তাঁর একটি কন্যা ও একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। সন্তানদের লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় খরচাদি বহন করতে পারছেন। বর্তমানে তিনি সমাজে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। পলি সমাজের অসহায় নারীদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে এবং নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন।

জুতা তৈরির ব্যবসায়ী অষ্টমী

শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএ্যাডভান্টেজড উইমেন

স্বামীহারা দরিদ্র পরিবারের বধূ অষ্টমী জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছেন। জুতা তৈরির কারখানা গড়ে তুলে তিনি নিজের, পরিবারের এবং পাড়ার অনেকেরই দারিদ্র্য ঘুচিয়েছেন।

অষ্টমী একজন দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। ২ ভাই ৫ বোন ও বাবা-মাকে নিয়ে সংসার। বাবা ও ভাই জুতা তৈরির কাজ করতেন। ঢাকা জেলার লালবাগ থানার ঋষী পাড়ায় মাটি ও বেড়ার ভাংগা ঘরে অষ্টমীর জীবন শুরু। বাবা-মা অল্প বয়সে বিয়ে দেন। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে একটি মেয়ে সন্তানের জন্ম হয়। স্বামীর সংসার বুঝার আগেই সংসারের দায়িত্ব পড়ে তাঁর কাঁধে। দ্বিতীয় সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় স্বামী পৃথিবী ছেড়ে চলে যান, শুরু হয় অষ্টমীর কঠিন সংগ্রাম। ২টি সন্তান আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে মরণপণ সংগ্রাম শুরু করেন তিনি। আত্মীয়-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের কাছে গিয়েছেন একমুঠো ভাত আর একটি কাজের জন্য, কিন্তু কেউ সাহায্যের হাত বাড়াননি। কেউ এগিয়ে আসেননি তাঁর দুর্দিনে। দরিদ্র পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে অনেক কিছু করার চিন্তা থাকলেও অর্থের অভাবে কিছু করতে পারছিলেন না। একসময় এলাকার একটি চুঁড়ি তৈরি কারখানায় কাজ নিলেন। প্রতিদিন ৪০/-টাকা আয় হতো। এ আয় দিয়ে কোনভাবেই সংসার চলে না। সংসারের অভাব যেন শেষ হবার নয়। একদিন অষ্টমী দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের কাছে জানতে পারলেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান শক্তি ফাউন্ডেশন-এর কার্যক্রমের কথা। তিনি জানতে পারেন, শক্তি ফাউন্ডেশন সমাজের অসহায় মহিলাদের নিয়ে গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করে থাকে। এই কথা শুনে অষ্টমী শক্তি ফাউন্ডেশন- এর মাঠকর্মীর সাথে আলোচনা করে তাঁদের পাড়ায় একটি কেন্দ্র গঠন করেন। কেন্দ্রের নাম পদ্ম, অষ্টমী ছিলেন এই কেন্দ্রের প্রথম গ্রুপের সভাপতি।

অষ্টমীর বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা চামড়া দিয়ে জুতা বানানোর কাজ করতেন। সেই সুবাদেই অষ্টমীর এই কাজটি সম্পর্কে ধারণা ছিলো এবং কাজ করার কিছু অভিজ্ঞতাও ছিল। একসময় অষ্টমী শক্তি ফাউন্ডেশন থেকে ৩,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে চামড়া দিয়ে জুতা তৈরির কাজ শুরু করেন। অষ্টমীর স্বামীর স্বপ্ন ছিল একটি জুতা তৈরির কারখানা করার। স্বামীর ইচ্ছা পূবণের জন্যই তিনি এই পেশা বেছে নিয়েছেন। প্রথম দফায় ৩,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করে আজ ১৯তম দফায় ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ বাবদ ১,০০,০০০/-টাকা গ্রহণ করে দক্ষতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছেন অষ্টমী। বর্তমানে তাঁর ব্যবসায় পুঁজি রয়েছে ৩,০০,০০০/-টাকা। এই ব্যবসায় অষ্টমী ছাড়াও তাঁর মেয়ে ও মেয়ের জামাই সরাসরি যুক্ত এবং ৪ জন কর্মচারী রয়েছেন। তাঁদেরকে সপ্তাহে ১,৫০০/-টাকা করে মাসে ৬,০০০/-টাকা বেতন দিচ্ছেন। প্রতি বছরের লাভের টাকা এবং শক্তি ফাউন্ডেশন হতে ঋণ নিয়ে কারখানা বড় করতে থাকেন। তাঁর এই ব্যবসা থেকে প্রতিমাসে ১২,০০০/-টাকা হতে ১৫,০০০/-টাকা আয় হয়। সংস্থার কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করে এবং সংস্থার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে অষ্টমী বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাতে নিজেকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। শারীরিক অসুস্থতা একটি হাত ও একটি পা-কে দুর্বল করে দিয়েছে, তারপরও

অষ্টমী থেমে থাকেননি। তিনি শুধু জানেন, এগিয়ে যেতে হবে পিছনে আর ফেরা নয়। অষ্টমীর কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে চামড়া ব্যবহার করা হয়। এই কাজ করতে তেমন কোন যন্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এই কাজে শ্রমিক পেতে কষ্ট হয় না, তবে দক্ষ শ্রমিকের অভাব রয়েছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা "কুটির শিল্প" কারখানাটিকে আরও বড় করে অবহেলিত ঋষী সম্প্রদায়-এর দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক মুক্তিসহ আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তির জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে "কুটির শিল্প" আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা, বাল্য বিবাহ রোধসহ ঋষী সম্প্রদায়কে যৌতুক প্রথা থেকে মুক্ত করা ও তাঁর পরবর্তী প্রজন্মকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর।

বর্তমানে লালবাগ ঋষী পাড়ায় অষ্টমীর বেশ সুনাম। তাঁকে এখন সমাজের সালিশে ডাকা হয়। অষ্টমী এখন ক্ষুধামুক্ত এবং দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে অনেক দূরে। আজ অষ্টমী আর্থিকভাবে সচ্ছল একজন সুখী মানুষ। তিনি দারিদ্র্যকে জয় করতে পেরেছেন এবং তাঁর স্বামীর স্বপ্ন পূরণ করার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি নিজেকে একজন সফল ব্যবসায়ী ও একজন সফল উদ্যোক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

নুরজাহান বেগমের জীবন কাহিনী

সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র

ঠাকুরগাঁও জেলা সদরের মেয়ে নুরজাহান। অভাবের সাথে বেড়ে উঠা । বিয়ের পর স্বামীর কাছ থেকে সেলাই কাজ শিখে সংসারের হাল ধরেছেন । সংস্থা থেকে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে কারখানা ভাড়া নিয়ে ক্রমশ ব্যবসার উন্নতি করেছেন। আজ তিনি সফল ।

ঠাকুরগাঁও জেলা সদরে নুরজাহান বেগমের পৈতৃক বসতভিটা। মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে ছিল সুখের জীবন। দশম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় সদর উপজেলার আদর্শ কলোনীর বাসিন্দা মোঃ মকিম উদ্দীনের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। স্বামী দর্জির কাজ করে মোটামুটি ভাল আয় করেন। নুরজাহান স্বামীর কাছ থেকে সেলাইয়ের কাজ শিখে, তাঁকে কাজে সাহায্য করেন। কয়েক বছর কাজ করার পর ঢাকায় পাড়ি জমান।

ঢাকায় এসে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করে ছোট বাচ্চা ও মহিলাদের পোশাক তৈরি করেন। তৈরি পোশাক বিভিন্ন মার্কেটে বিক্রি করতেন। এক পর্যায়ে ফুলবাড়িয়া বঙ্গ মার্কেটে একটি দোকান ভাড়া নেন। দুই বছর ব্যবসা করার পর মার্কেটে আগুন লেগে সব পুড়ে যায়। সন্তানদের নিয়ে নুরজাহান অসহায় হয়ে পড়েন। এরপর বাড়ির মালিকের মাধ্যমে সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে প্রথম দফায় ৪,০০০/-টাকা ঋণ নেন। এ টাকা দিয়ে নুরজাহান সেলাই মেশিন ক্রয় করেন। তাঁর স্বামী বিভিন্ন কারখানা থেকে বাচ্চাদের শার্ট এবং প্যান্টের সেলাই কাজের অর্ডার নিতেন। নুরজাহান ও তাঁর স্বামী রাত দিন পরিশ্রম করে সেলাই করে বাজারে বিক্রি করতেন। এভাবে যে আয় হত তা দিয়ে কিস্তি ও সংসার খরচ চলত। পরের বছর তিনি আবার ১০,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে আরেকটি সেলাই মেশিন ও কিছু কাপড় ক্রয় করেন। ছোট বাচ্চাদের প্যান্ট ও শার্ট তৈরি করে বিভিন্ন মার্কেটে বিক্রি করলে ভাল লাভ হয়।

নুরজাহান পরের বছর ১৫,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে একটি কারখানা ভাড়া নেন। মকিম উদ্দিন বিভিন্ন গার্মেন্টস থেকে রিজেক্ট প্যান্ট কিনে সেলাই খুলে আবার নতুন করে সেলাই করে বিভিন্ন মার্কেটে বাজারজাত করেন। এরপর নুরজাহান সংস্থা থেকে সপ্তম দফায় ১,০০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এ টাকা দিয়ে আবারও একটি কারখানা ও একটি গোডাউন ভাড়া নেন। তাঁর কারখানায় কর্মচারী রয়েছে ১০ জন। এসব কর্মচারীর মাসিক বেতন ৪,৫০০/-টাকা।

বর্তমানে নুরজাহান সব খরচ বাদে মাসে প্রায় ৩০,০০০/- থেকে ৩৫,০০০/-টাকা আয় করেন। তাঁর বড় ছেলে এইচ.এস.সি পাশ করে চাকুরি করছে। চাকুরির পাশাপাশি সে পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছেলে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছে। বর্তমানে নুরজাহান ৮ম দফায় ২,০০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪৪,০০০/-টাকা। নুরজাহান বেগম ঠাকুরগাঁও সদরে ১ বিঘা জমি ও তার উপর আধা পাকা বাড়ি তৈরি করেছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫,০০,০০০/-টাকার মালামাল আছে। তাঁর এখন সুখের সংসার।

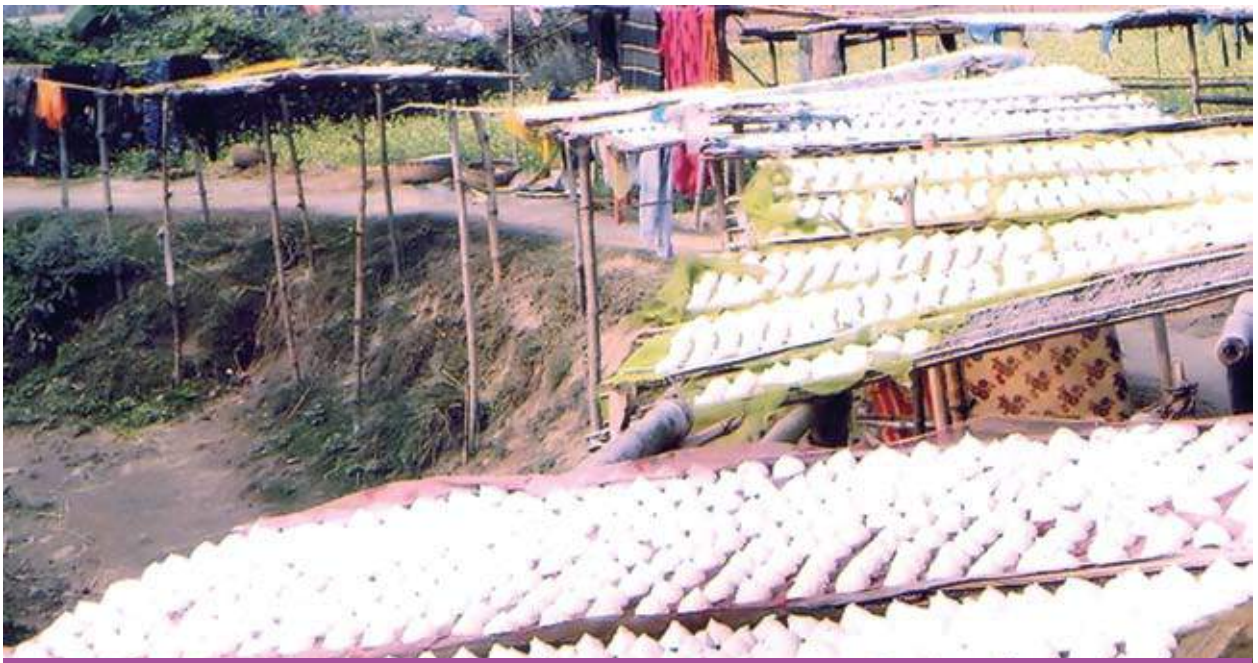

কুমড়া বড়ি'র ব্যবসায়ী বীথি রানী

এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার মেয়ে বীথি রানী। আর্থিক সংকটে পড়াশুনা বেশিদুর করতে পারেননি। বিয়ের পর স্বামীর সংসারেও অর্থ-কষ্ট লেগেই থাকত। সংস্থা থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কুমড়ার বড়ি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করার মাধ্যমে সংসারের অভাব দূর করেছেন। সমাজে তিনি এখন একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব।

রাজশাহী জেলার চারঘাট উপজেলার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে বীথি রানী। ২০০৩ সালে এস.এস.সি পাশ করার পর পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয়। স্বামী একজন দিনমজুর, আর্থিকভাবে তেমন সচ্ছল ছিলেন না। স্বামীর সংসারে এসে অর্থ কষ্ট লাঘবের জন্য গৃহ শিক্ষকতা শুরু করেন। পাশাপাশি কুমড়ার বড়ি তৈরি করে বিক্রির পরিকল্পনা করেন। বড়ি তৈরির জন্য টাকা সংগ্রহ করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এসিডি'র সুগন্ধা মহিলা সমিতির সদস্য হন। সদস্য হওয়ার ২ মাস পর ৫০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে কুমড়া বড়ি তৈরি করেন এবং তা বাজারে বিক্রি করেন। এভাবে কিস্তির টাকা পরিশোধ করে সঞ্চয় করতে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর কিছু মূলধন হয় এবং তিনি ৪টি ছাগলের বাচ্চা কিনে পালন করেন। এরপর সংস্থা থেকে আবার ১০,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে কুমড়া বড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি করেন। এককভাবে এই কাজ করতে সমস্যা হওয়ায় এলাকার একজন মহিলাকে মজুরিভিত্তিক নিয়োগ দেন।

বীথি রানী পর্যায়ক্রমে সংস্থা থেকে ১৫,০০০/-, ২০,০০০/-, ৩০,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে এবং নিজস্ব মূলধন যোগ করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে তাঁর সাথে ১০ জন মহিলা শ্রমিক কাজ করেন এবং সবাইকে কাজের বিনিময়ে ১,০০০/-, ১,৫০০/-টাকা করে মজুরি দেন। বর্তমানে বীথি রানীর কুমড়া বড়ি এলাকার চাহিদা মিটিয়ে রাজশাহী শহরে সরবরাহ করা হচ্ছে। তাঁর পরিবার এখন সচ্ছল, তাঁর কাচা বাড়ি হতে পাকা বাড়ি হয়েছে। সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করেছেন। সমাজে তাঁর ভালো অবস্থান তৈরি হয়েছে। বীথি রানীর ভবিষ্যত পরিকল্পনা ব্যবসা সম্প্রসারণ করে এলাকার দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

মুরগির খামারি নাজমা বেগম

সকলের জন্য কল্যাণ

নাজমা বেগমের জন্ম পিরোজপুর জেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামে। এক অসহায় দরিদ্র কৃষকের স্ত্রী তিনি। কৃষি বলতে অল্প একটু জমি চাষ। তাতে নুন আনতে পানতা ফুরায়। দিন যায় দরিদ্রতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায়, নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেন তিনি। প্রাথমিক অবস্থায় ২,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে মুরগি পালন শুরু করেন। আজ তিনি একটি খামারের মালিক।

পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর উপজেলার বাঁশবাড়ীয়া গ্রামে নাজমা বেগম ও তাঁর স্বামী দেলোয়ার হোসেনের বাস। অসহায় অবস্থায় কৃষিকাজ করে কোন রকমে তাঁদের সংসার চলতো। মূলধনের অভাবে কোন ব্যবসা করতে পারছিলেন না। একদিন 'সকলের জন্য কল্যাণ' সংস্থার একজন মাঠকর্মীর সাথে নাজমার পরিচয় হয়। তাঁর কাছে তিনি জানতে পারেন যে, সংস্থা অসহায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য সমিতি করে তাঁদের ঋণ ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করে থাকে। নাজমা একদিন সমিতির অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করে তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী শংকরপাশা মহিলা সমিতির সদস্য হন।

কিছুদিন পর নাজমা প্রথম দফায় ২,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করে দেশী মুরগি পালন করেন। এতে অনেক লাভ হয়। এভাবে প্রতিবছর নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে নতুন ঋণ গ্রহণ করেন। একসময় তিনি ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত হন। বর্তমানে তিনি ৫০,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে ৪০০ মুরগির একটি খামার করেছেন। এই খামারে ২ জন লোক নিয়মিত কাজ করেন। দৈনিক ৩০০ মুরগি ডিম দেয়, যার বাজার মূল্য ২,২৫০/-টাকা। মুরগি পালনের পাশাপাশি দুইটি পুকুরে মাছ চাষ করেন। মৎস্য অধিদপ্তর থেকে পুরস্কার হিসেবে ৫,০০০/-টাকা এবং একটি মেডেল পেয়েছেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে এখন তিনি সুখে আছেন। ছেলে এস.এস.সি পাশ করে কলেজে পড়ছে এবং মেয়ে এস.এস.সি পাশ করার পরে বিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে নাজমা মুরগি পালন ও মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী।

ব্যবসায়ী রাশিদা বেগম-এর সংগ্রামী জীবন

টিএমএসএস

সংগ্রামী নারী রাশিদা বেগম, জন্ম গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার এক নিবিড় গ্রামে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে মনের ভিতরে আঁকতে থাকেন এক নতুন জীবনের স্বপ্ন। অতি কষ্টে কিছু টাকা যোগাড় করে শুরু করেন জীবন সংগ্রাম। একে একে প্রতিষ্ঠা করেন ফার্মেসী, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার রাশেদা বেগমের জীবনের লক্ষ্য ছিল সমাজে পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠীর জন্য কিছু একটা করা। দরিদ্র পরিবারে জন্মের কারণে অনেক কিছু করার চিন্তা থাকলেও অর্থের অভাবে কোন কিছুই করতে পারছিলেন না। অবশেষে তিনি সবুজ ছাতা ক্লিনিকে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে চাকুরি শুরু করেন। প্রতিদিন হাত খরচ বাবদ ৪০/-টাকা আয় করতেন এবং এ আয় দিয়ে কোনমতে সংসার চালাতেন। চাকুরির পাশাপাশি তিনি ১২০০/-টাকার পুঁজি নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ঔষধ বিক্রি শুরু করেন। চাকুরি এবং ব্যবসার ফাঁকে পল্লী চিকিৎসক ও নিউমোনিয়া প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। রাশেদা ও তাঁর স্বামী মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন শ্রীপুর এম সি বাজারে ছোট একটা দোকান ভাড়া নিয়ে ঔষধের ব্যবসা শুরু করবেন। কিন্তু টাকার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ালেও কেউ তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াননি।

একদিন রাশেদা ঔষধ বিক্রির সময় টিএমএসএস-এর কর্মীর সাথে পরিচিত হন। রাশেদা টিএমএসএস-এর মাঠকর্মীর সাথে আলোচনা করে তাঁদের পাড়ায় সমিতি গঠন করলেন। প্রথম দফায় ক্ষুদ্র উদ্যোগী হিসেবে ৫০,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে "রাসেল ফার্মেসী" নামে ঔষধের দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। দোকানে প্রতিদিন গড়ে ৬০০০-৭০০০/-টাকার ঔষধ বিক্রি হয়, যা থেকে খরচ বাদ দিলে তাঁর দৈনিক আয় হয় ৬০০ থেকে ৭০০/-টাকা। বর্তমানে তাঁর একটি ফার্মেসী, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার রয়েছে। তাঁর ব্যবসায় ১১ জন লোক কাজ করেন। সব মিলিয়ে প্রতি মাসে ১৫ হাজার হতে ২০ হাজার টাকা আয় হয়। রাশেদা তাঁর গৃহীত প্রতিটি ঋণ যথাসময়ে পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে তিনি ৩য় দফায় ২,০০,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছেন। ব্যবসায় উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে। সংসারে আগের সেই আর্থিক সংকট নেই। রাশেদার চোখে এখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন।

ব্যবসার পাশাপাশি রাশেদা সমাজসেবামূলক কাজ অব্যাহত রেখেছেন। সবুজ ছাতা, সূর্যের হাসি ক্লিনিকসহ জাতীয় টিকা দিবস পালনের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী দরিদ্র জনগণকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ শিক্ষামূলক কার্যক্রম তিনি নিজ উদ্যোগে পরিচালনা করছেন। তিনি তাঁর ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিত করে অধিক সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেন।

ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বেলী বেগম-এর সাফল্যগাঁথা

আরচেস

সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার চৌবাড়ী গ্রামের গৃহিণী মোছাঃ বেলী বেগম। দারিদ্র্যের তাড়নায় কাঠের আসবাবপত্র বানানোর কাজ শিখে কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কারখানায় এলাকার ১২ জন দরিদ্র লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্যকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি একজন কর্মঠ ও সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা।

মোছাঃ বেলী বেগম-এর জীবনের লক্ষ্য ছিলো সমাজের পিছিয়েপড়া দলিত সম্প্রদায়ের জন্য কিছু করার। দরিদ্র পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে অনেক কিছু করার চিন্তা থাকলেও অর্থের অভাবে কিছু করতে পারছিলেন না। দিনমজুর হিসাবে প্রতিদিন ৫০/-টাকা আয় দিয়ে কোনভাবেই সংসার চলে না। অবশেষে বাড়ির কাছেই কাঠের আসবাবের কারখানায় কাজ শিখলেন। ১৯৯৮ সালের কথা, বেলী বেগম আর তাঁর স্বামী মিলে পরামর্শ করে ঠিক করলেন তাঁরা একটি কারখানা করবেন। টাকার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ালেও কেউ তাঁদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন না। একদিন বেলী বেগম দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের নিকট হতে বেসরকারি সংস্থা "আরচেস" এর কথা জানতে পারেন। তিনি জানতে পারেন, আরচেস সংস্থা সমাজের অসহায় মানুষকে নিয়ে সমিতি গঠন করে ঋণ প্রদান করে থাকে। এই কথা শুনে বেলী বেগম তাঁদের পাড়ায় সমিতি গঠন করলেন। প্রথম দফায় ২,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে পরিত্যক্ত এবং পুরাতন কাঠ দ্বারা চেয়ার, টেবিল, টুল, বেঞ্চ ইত্যাদি তৈরি করা শুরু করলেন এবং বিভিন্ন হাট বাজারে বিক্রি করতে লাগলেন। এরপর তাঁকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রতিবছর অর্জিত লাভের পাশাপাশি ঋণ নিয়ে কারখানা বড় করতে থাকেন। বর্তমানে তাঁর প্রকল্পে ১২ জন লোক কাজ করেন, এরমধ্যে ২জন পরিবারের সদস্য। প্রতি মাসে ৩০,০০০ হতে ৪০,০০০/-টাকা আয় হয়। তাঁর প্রকল্পে কাজ করে ১০টি পরিবার তাঁদের সংসার পরিচালনা করছেন। তাঁর ব্যবসায় বিশেষভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন দরিদ্র ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, বেকার যুবক ও বৃদ্ধ।

বেলী বেগম প্রথম দফায় সংস্থা হতে ২,০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে কারখানার উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। বেলী বেগম ১০ম দফায় ৩০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাঁর আয় থেকে সহজেই সংস্থার কিস্তি পরিশোধ করতে পারছেন। সংসারের প্রতি আনুগত্য এবং কর্মনিষ্ঠ থাকার কারণে বেলী বেগম বর্তমান ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা হতে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাতে পরিণত হয়েছেন। বেলীর কারখানার কাঁচামাল হিসাবে কাঠ ব্যবহৃত হয়, যা বেশ সহজলভ্য। এই কাজ করতে তেমন কোন যন্ত্রেরও প্রয়োজন হয় না। শুধুমাত্র করাত, হাতুড়ি, বাটাল, রেনদা, রেঞ্জ দিয়েই এই কাজ করা যায়। এই কাজে শ্রমিক পেতে কষ্ট হয় না এবং শ্রমিকদেরও কাজ করতে সমস্যা হয় না। কর্মরত শ্রমিকেরা প্রতিদিন ২০০ থেকে ৪০০/-টাকা আয় করে তাঁদের পরিবার পরিজন নিয়ে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছেন এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারছেন। এই কারখানায় কাজ করে ২ জন শ্রমিক নিজের কারখানা গড়েছেন। বেলী বেগমের উদ্যোগের সাথে তাঁর পরিবার

ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে তাঁর স্বামী তাঁকে বেশ সহায়তা করেন। এছাড়া ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়ার পাশাপাশি সমস্ত কাজ দেখাশুনা করেন। বর্তমানে বেলী বেগমের চৌবাড়ী গ্রামসহ কামারখন্দ উপজেলায় বেশ সুনাম। উদ্যোক্তা হিসাবে বেলী বেগমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তি জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তাঁর কারখানাটি আধুনিক করার মাধ্যমে দেশীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করা। পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক মুক্তিসহ আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। মানুষকে অভাব-অনটনের হাত থেকে রক্ষা করা, বাল্যবিবাহ রোধসহ যৌতুক থেকে মুক্ত করা ও ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করা। বেলী বেগমের কারখানায় কোন ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় না বিধায় পরিবেশের কোন ক্ষতি হয় না। খুলনা, বাগেরহাট, দিনাজপুর, ফুলবাড়ী, রংপুর ও পঞ্চগড় হতে বেলী বেগম কাঠ সংগ্রহ করেন। বর্তমানে সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলায় বেলী বেগমের উৎপাদিত পণ্য পাইকারীভাবে বাজারজাত হচ্ছে।

বাংলাদেশের গ্রামে বসবাসকারী জনগণের অধিকাংশই কাঠের তৈরি আসবাবপত্র ব্যবহার করেন বিধায় তাঁর কারখানা/প্রকল্প আর্থিকভাবে টেকসই রয়েছে। ফলে উৎপাদিত দ্রব্য বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যা হয় না। উৎপাদন খরচের তুলনায় লাভ বেশি হয়। বর্তমানে বেলী বেগমের প্রকল্পে প্রায় ৮,০০,০০০/-টাকা বিনিয়োগ রয়েছে। তাঁর কারখানা ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

গাভী পালন করে কুলছুম এখন স্বাবলম্বী

পাবনা প্রতিশ্রুতি

দরিদ্র কুলছুম হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে অভাবকে জয় করেছেন। পরিশ্রম আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ঋণ সহযোগিতায় বর্তমানে তিনি গরুর খামার গড়ে তুলেছেন। তিনি এখন একজন স্বাবলম্বী নারী।

পাবনা জেলার সদর উপজেলার গয়েশপুর ইউয়িনের জোতগেরী জালালপুর গ্রামের মোঃ কেসমত আলীর স্ত্রী মোছাঃ কুলছুম বেগম। মা-বাবার সংসারে অভাব আর দুঃখ কষ্টের মধ্যে বড় হয়েছেন। স্বামীর সংসারে এসেও অভাব যেন পিছু ছাড়ছিল না। রিক্সাচালক স্বামীর দৈনিক ৪০-৫০/-টাকা আয় দিয়ে কোন মতেই তাঁদের সংসার চলে না। একসময় কুলছুম তাঁর স্বামীর সাথে পরামর্শ করে ঠিক করলেন, তিনি নিজেও কাজ করবেন। কাজের জন্য যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন তা তাঁর কাছে নেই। অবশেষে কুলছুম বেগম বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পাবনা প্রতিশ্রুতির শরণাপন্ন হলেন। সংস্থা সমিতির সদস্যদের পর্যায়ক্রমে হাঁস-মুরগি, ছাগল ও গাভী পালন এবং শাক সবজি ও মাছ চাষসহ বিভিন্ন ধরনের আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। তখন কুলছুম বেগম পাবনা প্রতিশ্রুতির মাঠকর্মীর সাথে যোগাযোগ করে তাঁদের পাড়ার ২০ জন মহিলাদের সংগঠিত করে একটি সমিতি গঠন করেন। কুলছুম হলেন সেই সমিতির সভানেত্রী।

কুলছুম প্রথম দফায় ২,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন। সেই টাকা শোধ করে পরের বছর আবার ৪,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে ২টি ছাগল এবং আরো কিছু হাঁস ক্রয় করেন। ৩য় দফায় ৮,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে ৪টি ছাগল ক্রয় করেন এবং ধীরে ধীরে খামার বড় হতে থাকে। সংস্থা থেকে ২০,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে এবং হাঁস-মুরগি পালন বন্ধ করে ২টি গাভী ক্রয় করেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ছোট আকারের একটি গরুর খামার দিতে সক্ষম হন। নিয়মিত ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ এবং সংস্থার প্রতি আনুগত্য থাকার কারণে কুলছুম বেগম ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা হতে ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ গ্রহীতায় পরিণত হয়ে ১,০০,০০০/-টাকার ঋণ গ্রহণ করেছেন। কুলছুম বেগম ১ বিঘা জমির মালিক থেকে ৫ বিঘা জমির মালিক হয়েছেন। ছোট একটি টিনের ঘর থেকে সেমি পাকা একটি টিনশেড ঘর করেছেন। গরুর খামারের জন্য একটি টিনের ঘর নির্মাণ করেছেন এবং তাঁদের নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়নসহ জীবনযাত্রার মানকে করেছেন আধুনিক। কুলছুম দম্পতি নিঃসন্তান। কুলছুম দম্পতির জোতগেরী জালালপুর গ্রামে বেশ সুনাম। বর্তমানে কুলছুম বেগমের খামারে ২টি গাভী, ৫টি এঁড়ে বাছুর আছে। নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে প্রতিদিন ৪০/-টাকা হিসাবে ১০ লিটার দুধ বিক্রি করছেন। স্বামী- স্ত্রী মিলে নিজেদের খামারে কাজ করছেন এবং নিজের জমিতে চাষাবাদ করছেন। জমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হয় তা পরিবারের প্রয়োজন মিটিয়েও কিছুটা বিক্রি করা সম্ভব হয়। কুলছুম-এর খামারে বর্তমানে প্রায় ৩,০০,০০০/-টাকার গরু আছে। তাঁর খামার ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

উদ্যোক্তা কায়মা

মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র

কায়মা একজন দরিদ্র মহিলা। দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার দীঘন গ্রামে তাঁর বাস। নিজের বুদ্ধি, প্রচেষ্টা, স্বামী ও ছেলেদের সহযোগিতায় বর্তমানে সুখের সংসার গড়ে তুলেছেন। একসময়ের অসহায় ও নিঃস্ব এই মহিলাটি জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এলাকায় মাথা উঁচু করে টিকে আছেন।

কায়মা বেগম আশির দশকে ছেলেমেয়ে নিয়ে এক দুঃসহ জীবন যাপন করছিলেন। সে সময় তাঁর মাথা গোঁজার ঠাঁই পর্যন্ত ছিল না। অন্যের জায়গায় কোন রকমে ছোট্ট ১টি খড়ের ছাপড়া ঘর তুলে বসবাস করতেন। স্বামী একমাত্র উপার্জনকারী ভ্যানচালক। স্বামীর আয় রোজগার দিয়ে এতগুলো লোকের ভরণপোষণ চলছিল না। প্রতিনিয়ত অভাব অনটন ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। এমতাবস্থায় কায়মা বেগম সংসারের দুর্দিন ঘোচাতে অন্যের বাড়ি ও জমিতে কাজ শুরু করেন। তিনি দৈনিক মজুরি পেতেন ৪০ থেকে ৫০/-টাকা। তা দিয়ে স্বামীর আয়ের সঙ্গে যোগান দিয়ে কোনমতে দিন অতিবাহিত করতেন।

দিন যায় ছেলেমেয়েরা বড় হতে থাকে, সেইসাথে পাল্লা দিয়ে অভাব, অনটন, অসুখ-বিসুখও বাড়তে থাকে। সারাদিন পরিশ্রম করার পরও স্বামী-স্ত্রী'র অভাব মোকাবেলার চিন্তা শেষ হয় না। তাঁরা চিন্তা করেন এভাবে হয়তো আর দিন চালানো যাবে না। আয় বৃদ্ধির জন্য কিছু করতে হলে পুঁজির দরকার। কিন্তু টাকা পাবেন কোথায়? কে দিবে টাকা? কোন কুল কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। টাকা যোগাড়ের জন্য পাড়া প্রতিবেশীর কাছে ধার চাইলে কেউ ধার দেন না। কারণ কায়মার জামানত রাখার মতো কোন কিছু ছিল না। এমনি সময় গ্রামের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দেন, যে কোন সমিতি বা এনজিও হতে ঋণ নিয়ে কাজ করার। তখন কায়মা বেগম এপাড়া ওপাড়া খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, পাশের পাড়ায় মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে) সমিতি পরিচালনা করে। এমবিএসকে'র মাঠকর্মীর সাথে কায়মা বেগমের দেখা হয়। কর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী কায়মা বেগম গ্রামের মহিলাদের নিয়ে একটি সমিতি করার পরিকল্পনা করেন। এরপরেই কর্মী উক্ত পাড়ায় গিয়ে যাচাই বাছাই করে শাখা ব্যবস্থাপকের অনুমোদন সাপেক্ষে দীঘন মহিলা সমিতির কার্যক্রম চালু করেন। সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী কায়মা প্রথম পর্যায়ে ৩০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করেন ও তাঁর দৈনিক মজুরির জমাকৃত অর্থ সমন্বয় করে ১টি বাছুর গরু ক্রয় করেন। গরু ক্রয় করে লালন পালন করে বড় করেন। এদিকে কাজ করে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন। উক্ত বাছুর গরুটি ১ বছর পর ৫০০০/-টাকায় বিক্রি করেন। পরবর্তী দফায় ৫০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে মোট ১০,০০০/-টাকায় ১টি গাভী ক্রয় করেন। গাভীর দুধ বিক্রি করে ঋণের টাকা পরিশোধ করেন। ঋণ পরিশোধ হলে ২টি গরুই তাঁদের নিজেদের হয়ে যায়। বর্তমানে কায়মা বেগমের ৫টি গরু রয়েছে। যার বর্তমান মূল্য ১,০০,০০০/-টাকার উপরে। ইতোমধ্যে এমবিএসকে হতে ঋণ নিয়ে বাড়ির জন্য ১২ শতক জমি ক্রয় করে সেখানে নিজস্ব বাড়ি তৈরি করেছেন। তাঁর ছেলেদেরকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। পরিবারের সকলের প্রচেষ্টায় সংসারটাকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

একসময় কায়মার স্বামী অন্যের বাড়িতে কাজ বাদ দিয়ে নিজস্ব ভ্যানের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে খড় বিক্রির ব্যবসা শুরু করেন। কায়মার ইচ্ছা ছিল ভাল একটা কিছু করার, যার কারণে ২টি ছেলেকে বেসরকারি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ড্রাইভিং শিক্ষা দেন এবং সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিআরটিএ থেকে বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স গ্রহণ করেন। তাঁর মেজ ছেলেকে মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র থেকে ৫০,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে স্থানীয় বাজারে টমেটোর ব্যবসায় সম্পৃক্ত করেন। কায়মা ২ বছরে প্রায় ১,০০,০০০/-টাকা ঋণ নিয়েছেন। তিনি ঋণের টাকার সাথে নিজস্ব কিছু টাকা মিলিয়ে প্রায় ৩,৫০,০০০/-টাকা দিয়ে পুরাতন ১টি ট্রাক্টর ও ট্রলি ক্রয় করেন। যার মাধ্যমে প্রতি মাসে প্রায় ১৫,০০০/- থেকে ২০,০০০/-টাকা আয় করেন। সর্বশেষ দফায় ১,২৫,০০০/-টাকা ঋণ নিয়ে আরও ১টি ট্রাক্টর ক্রয় করেন। উক্ত ট্রাক্টরের মাধ্যমে কায়মা বেগম তাঁর দুই ছেলেসহ আরও ৬/৭ জন লোকের কর্মসংস্থান করেছেন। বর্তমানে তিনি ট্রলির ব্যবসা, গরু পালন ও খড়ের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। দৈনিক তাঁর আয় হচ্ছে ২০০০/-থেকে ২৫০০/-টাকা ।

বর্তমানে তিনি স্বামী, সন্তান ও নাতি-নাতনীদের নিয়ে বেশ সুখে শান্তিতে বসবাস করছেন। আগামীতে ১টি ট্রাক ক্রয় করার আশা আছে তাঁর। এলাকায় কায়মা এবং তাঁর পরিবারকে সবাই চেনে। কায়মা পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অসহায় মানুষদেরকে সংস্থা থেকে ঋণ সেবা নিয়ে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানান।

নারী উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা

১৫ মার্চ, ২০১২ পিকেএসএফ ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সহযোগী সংস্থার নির্বাহী প্রধান/নারী কর্মকর্তা ও উপকারভোগীর নামের তালিকা

ক্রম	সহযোগী সংস্থার নাম	নির্বাহী প্রধান/ নারী কর্মকর্তার নাম	সংস্থার উপকারভোগীর নাম
১	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী	কামরুন নাহার	সখিনা বেগম
২	পাবনা প্রতিশ্রুতি	মমতা চাকলাদার	কুলছুম বেগম
৩	গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	অধ্যাপক আলতাফুন্নেসা	উপস্থিত ছিলেন না
৪	অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট	উম্মে রোমান আক্তার	সালেহা বেগম
৫	সোস্যাল আপলিফ্টমেন্ট সোসাইটি	আনোয়ারা বেগম	কাজল আক্তার
৬	জয়পুরহাট রুরাল ডেভেলপমেন্ট মুভমেন্ট	রাজিয়া সুলতানা	মোর্শেদা বেগম
৭	সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র	সাইদা রোকসানা খান	মোসাম্মৎ নুরজাহান
৮	এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট	নাহিদা সুলতানা	বিথী রানী সরকার
৯	সকলের জন্য কল্যাণ	শামীমা রানী	নাজমা বেগম
১০	সাজেদা ফাউন্ডেশন	ইয়াসমিন আক্তার বৃষ্টি	মোছাঃ ডলি
১১	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি	মাজেদা শওকত আলী	আলেকজান রুমা
১২	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র	রাজিয়া হোসেন	মোছাঃ কায়মা খাতুন
১৩	আরচেস	আবিদা সুলতানা	বেলী বেগম
১৪	প্রোগ্রামস্ ফর পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট	নাজনীন চৌধুরী	মরিয়ম আক্তার পলি
১৫	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ	জলি বেগম	মোঃ রাশিদা বেগম
১৬	শক্তি ফাউণ্ডেশন ফর ডিসএ্যাডভান্টেজড উইমেন	ড. হুমায়রা ইসলাম	অষ্টমী রাণী
১৭	আরডিআরএস বাংলাদেশ	ডাঃ সেলিমা রহমান/ মঞ্জুশ্রী সাহা	মোসলেমা বেগম
১৮	প্রত্যাশী	মনোয়ারা বেগম	জান্নাতুল ফেরদৌস
১৯	পল্লীশ্রী	শামিম আরা বেগম	উপস্থিত ছিলেন না
২০	শ্রম উন্নয়ন সংস্থা	বেগম কামরুন্নেছা আশরাফ	উপস্থিত ছিলেন না
২১	অলটারনেটিভডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ	মোহাসেন আরা রুনা	উপস্থিত ছিলেন না
২২	দারিদ্র নিরসন প্রচেষ্টা	রাশিদা বেগম	উপস্থিত ছিলেন না
২৩	ডাক দিয়ে যাই	শাহানাজ পারভীন	উপস্থিত ছিলেন না
২৪	ধরিত্রী	আদন ইসলাম	উপস্থিত ছিলেন না
২৫	বিজ	সাইফুল ইসলাম রবিন	উপস্থিত ছিলেন না
২৬	ওয়েভ ফাউণ্ডেশন	মহসিন আলী	উপস্থিত ছিলেন না
২৭	সজাগ	আব্দুল মতিন	উপস্থিত ছিলেন না
২৮	ডরপ	এ, এইচ, এম নোমান	উপস্থিত ছিলেন না
২৯	সোপিরেট	প্রফেসর এম. মোসলেহ্ উদ্দীন	উপস্থিত ছিলেন না
৩০	আরবান	কামালউদ্দিন	উপস্থিত ছিলেন না
৩১	ডিএসকে	ডাঃ মাসুদুল কাদের	উপস্থিত ছিলেন না
৩২	উদ্দীপন	এমরানুল হক চৌধুরী	উপস্থিত ছিলেন না
৩৩	আরআরএফ	পিংকু রিতা বিশ্বাস	উপস্থিত ছিলেন না
৩৪	জিকেএসএস	রেবেকা সুলতানা	উপস্থিত ছিলেন না

নারীপ্রধান সহযোগী সংস্থার তালিকা

ক্র.নং	সহযোগী সংস্থার নাম
১	অন্তর সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট
২	অলটারনেটিভ ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ
৩	আরচেস
৪	আলো
৫	এ্যাসোসিয়েশন ফর কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি)
৬	গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
৭	জিকেএসএস
৮	ঠেংগামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)
৯	দারিদ্র্য নিরসন প্রচেষ্টা
১০	নড়াইল আশার আলো
১১	নড়িয়া উন্নয়ন সমিতি
১২	পল্লী মঙ্গল কর্মসূচী (পিএমকে)
১৩	পল্লীশ্রী
১৪	পভার্টি এলিভিয়েশন এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (পারডো)
১৫	পাবনা প্রতিশ্রুতি
১৬	প্রত্যাশী
১৭	প্রোগ্রামস্ ফর পিপলস্ ডেভেলপমেন্ট (পিপিডি)
১৮	মহিলা কল্যাণ সংঘ
১৯	মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্র (এমবিএসকে)
২০	শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিসএ্যাডভান্টেজড উইমেন
২১	শাপলাফুল
২২	শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন
২৩	শ্রম উন্নয়ন সংস্থা
২৪	সকলের জন্য কল্যাণ
২৫	সাজেদা ফাউন্ডেশন
২৬	সেবা নারী ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
২৭	সোস্যাল আপলিফ্টমেন্ট সোসাইটি (সাস)
২৮	স্বাবলম্বী উন্নয়ন সমিতি

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, প্লট-ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ৯১৪০০৫৬-৫৯, ৯১২৬২৪০-৪২, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯১২৬২৪৪
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org, ওয়েব সাইট: pksf-bd.org